বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের মুখপত্র

ছায়াচিত্র

২৬ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র উৎসব

সংস্কৃতি লোকমঞ্চ

০৪-০৭ জানুয়ারী, ২০২৪

ছায়াচিত্র

২৫ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আয়োজক

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

সহযোগিতায়

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন

বর্ধমান পৌরসভা

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অফ্ ইন্ডিয়া

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

মুক্তমঞ্চ, ১ নং খালুইবিল মাঠ, বর্ধমান- ৭১৩১০১

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের মুখপত্র
ছায়াচিত্র-র বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশক ঃ বাপ্পাদিত্য দাঁ
সম্পাদক
বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

সম্পাদনা ঃ তারকনাথ দত্ত
সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়
অরিন্দম সরকার

তারিখ ঃ ৪ জানুয়ারী ২০২৪

প্রচ্ছদ ঃ 'পি.ডি. গ্রাফিক্স সলিউশন'
বর্ধমান
মোঃ- ৯৬৪৭৬৮১৩৯৭ / ৮২৯৩৩২২০১৪

মুদ্রণে ঃ 'পি.ডি. গ্রাফিক্স সলিউশন'
বর্ধমান
মোঃ- ৯৬৪৭৬৮১৩৯৭ / ৮২৯৩৩২২০১৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলচ্চিত্র
শিল্প – সাহিত্য – সংস্কৃতি
ও সমাজমনস্ক
যে সব মানুষদের
আমরা হারিয়েছি তাঁদের
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি

২৫ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ শ্রী পূর্ণেন্দু কুমার মাজি, জেলা সমাহর্তা, পূর্ব বর্ধমান
আমনদীপ, আই.পি.এস. জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, পূর্ব বর্ধমান
শ্রী পরেশচন্দ্র সরকার, পৌরপতি, বর্ধমান পৌরসভা

সভাপতি ঃ শ্রী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ, পূর্ব বর্ধমান

কার্যকরী সভাপতি ঃ ড. ষোড়শীমোহন দাঁ, সভাপতি, বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

সহ-সভাপতি ঃ গার্গী নাহা, সহ-সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ, পূর্ব বর্ধমান
ড. সুকৃতি ঘোষাল, কার্যকরী সভাপতি, বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

সম্পাদক ঃ বাপ্পাদিত্য দাঁ, সম্পাদক, বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

কোষাধ্যক্ষ ঃ সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ, বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

কার্যকরী সদস্য ঃ ডাঃ অশোক মজুমদার, ড. সত্যদর্শন দত্ত, তারকনাথ দত্ত, অরিন্দম সরকার, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ড. মন্টু সাহা, ড. রঙ্গনা দে, অনন্ত মন্ডল, জনার্দন রায়, শীর্ষেন্দু সাধু, সঞ্জয় ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সমরেশ রায়, সুভাষচন্দ্র মন্ডল, তন্দ্রা মুখার্জী, কিশোর মন্ডল, অনিমেষ চ্যাটার্জী, সন্তোষ পাল।

২৫ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

০৪-০৭ জানুয়ারী ২০২৪
সংস্কৃতি লোকমঞ্চ
অনুষ্ঠান সূচী

উদ্বোধন
৪ জানুয়ারী ২০২৪, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০

উদ্বোধক
শ্রী শেখর দাস
বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক

উদ্বোধনী চলচ্চিত্র
'চালচিত্র এখন'

০৫.০১.২০২৪
নৈ
পরিচালক- রিমা বোড়া
৯১ মিনিট, অসম, ভারত, ২০২১

০৫.০১.২০২৪
Cream of the Crop
পরিচালক- দিনা সালাম
১০০ মিনিট, মিশর, ২০২২

০৬.০১.২০২৪
বিউটি সার্কাস
পরিচালক- মাহমুদ দিদার
১২০ মিনিট, বাংলাদেশ, ২০২২

০৬.০১.২০২৪
Commitment Phobia
পরিচালক- Helena Huefnagel
৮৪ মিনিট, জার্মানি, ২০২১

০৭.০১.২০২৪
পায়ের ছাপ
পরিচালক- সফিকুল ইসলাম মান্নু
১২০ মিনিট, বাংলাদেশ, ২০২২

০৭.০১.২০২৪
লক্ষ্মীর পা
পরিচালক- অভীক দাস
৭৫ মিনিট, ভারত, ২০২২

বিষয়সূচী

RAMBLING THOUGHTS	:	Mrinal Sen	০৯
পোটেমকিন	:	মৃণাল সেন	১৭
মরীচিকার বাসিন্দা - মৃণাল সেনের 'পরশুরাম'	:	অমিতাভ নাগ	২০
পাশ থেকে দেখা	:	গীতা সেন	২৯
বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র ও চলচ্চিত্র উৎসব— তিন দশকের ধারাবাহিকতা	:	সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের বিগত এক বছর	:	বাপ্পাদিত্য দাঁ	৩৬
২৫তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রদর্শিত ছবির সারাংশ	:		৪০

আমাদের কথা

এসে গেল ২৫তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। করোনা মহামারী অতিক্রম করে সীমিত আর্থিক সংগতি নিয়ে মফস্বলের একটি সিনেমা ক্লাবের টিকে থেকে ধারাবাহিক এই উৎসব উদ্‌যাপন কম বিস্ময়ের নয়। ৪-৭ জানুয়ারী ২০২৪ এর এই চলচ্চিত্র উৎসবে দেশী-বিদেশী ৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল মৃণাল সেনের। যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিনের মুক্তিরও ১০০ বছর এসে গেল। অন্যান্য অনেকের মতো পোটেমকিন-মুগ্ধ মৃণাল সেনের একটি লেখা ছাপা হল ছায়াচিত্রে। এছাড়া, ব্যক্তি মৃণাল সেনকে নিয়ে শোভা সেন এবং মৃণাল সেনের আরও অন্য একটি লেখাও ছাপা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অরিজিনালি অন্যত্র ছাপা এই লেখা তিনটি পরবর্তীকালে ছায়াচিত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রেরও ৩০ বছর বয়স হল। মফস্বলের একটি সিনে ক্লাবের পক্ষে এ সময়টা বড় কম নয়। বর্ধমানবাসীর অফুরন্ত সহযোগিতা ও ভালবাসা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর বৃহত্তম সেকুলার গণতন্ত্রের মন্দির-মসজিদ স্থাপনা, পৃথিবীর প্রায় দশটি (!) দেশের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় শোচনীয় পরাজয়, তেলপিঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি-এসব জাগতিক ঘটনা ও সমস্যাকে ট্যাকল্ করেও যে একটি ছোট শহরের মানুষজন এখনও সিনেমা দেখে আনন্দ পাচ্ছেন, হলে আসছেন সেটা ভেবেও আমরা আশান্বিত।

কারা এই চর্চা কেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? কর্ম সমিতির সদস্যরা? বিজ্ঞাপনদাতারা? 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি' অন্তর্যামী কোথায়? - চর্চা কেন্দ্রের শুভার্থী প্রকৃত সদস্যরা। আমরা কৃতজ্ঞ। আসুন আপনারা সদলবলে চলচ্চিত্র উৎসবে। দেখুন সপরিবারে। মফস্বলের এই সিনেমা ক্লাবকে বাঁচিয়ে রাখুন।

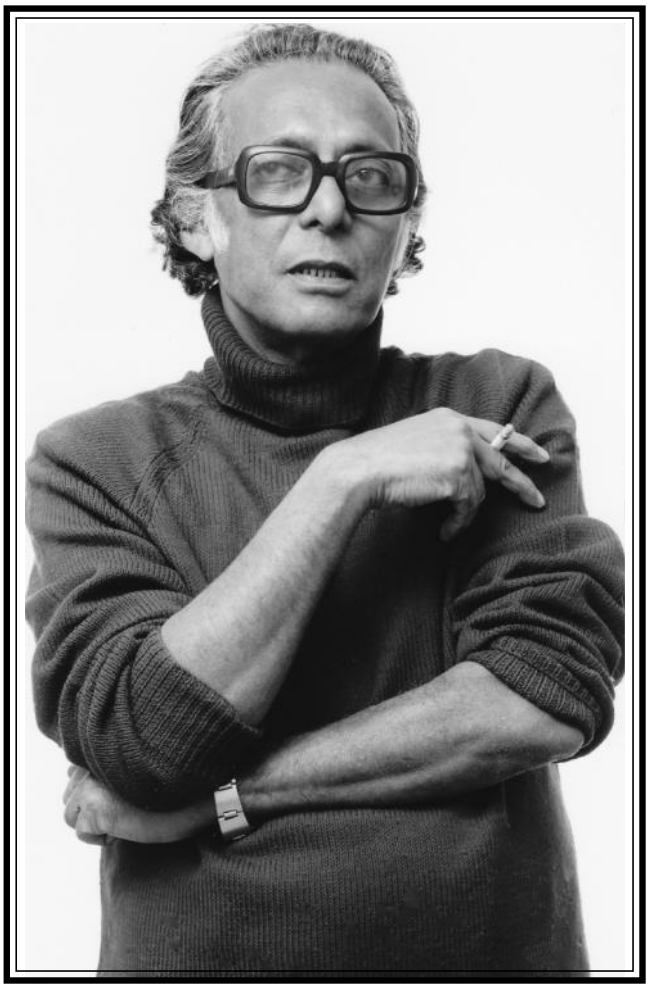

(১৯২৩-২০১৮)

RAMBLING THOUGHTS ....

Mrinal Sen

Let me tell you a truth about myself. Knowing the man as I am, I am pretty certain I am somewhat of a misfit in a distinguished assembly such as this here. I make a clean confession that I am no academic, I am no researcher in a strictly academic sense, no scholar, and frankly speaking, I have no flair for archival probe. To make a blatant statement about my own self, all my life till this very moment I have lived in the instant present. Coming to my frequent encounters with the past– distant and not so distant, and even when I have visited the museums and have been to the sites of historical relics, my spontaneous reactions have always been not to look at them as museum pieces but as contemporary phenomena.

In this context, to make a beginning, I am tempted to narrate an incident, but I am not quite sure if it will make any sense to you.

Not long ago that was in a week-long programme in Rome, Shabana Azmi, the actor and I, we, took a day off and went to the monumental centre of ancient Rome. Walking through the imperial ruins we came to the Great Square of the stupendous colosseum. As you know very well, this was originally a part of the villa of the emperor Nero–the most controversial among the worst Roman emperors. With bits of history on our back–Shabana's and mine, we stood before the Great Square. None of us spoke a word for a few moments. We just could not. Moments passed and it was Shabana who broke the silence. "Fantastic!", she said in whisper, almost to herself. This immediately reminded me of a short sequence of my film 'Bhuvan Shome' when, watching a dilapidated summer resort of a local Raja raising its truncated head at the top of an imposing flight of stairs on the sea beach, Utpal Dutt, my actor, said the same word, same way, almost to himself. Here, standing before the historic Square, Shabana said it and lost no time to pull out a note-book from her wallet and rushed to the nearest tablet to scribble quick notes. I saw her moving from one tablet to another and from one board to another, taking brisk notes from the writing on tablets and boards displayed at various points. As she was doing so, and got lost behind the huge pillars, I kept looking at the sprawling ruins–all opulent details, craggy shapes all around, broken walls, decayed arches–all threatening immediate collapse.

Like a child collecting shells on the sea beach, even braving waves, Shabana was running about-up and down-collecting history. I did nothing of the sort–just kept walking and looking around enjoying the lovely scene.

On our way back to the car walking through the ruins, Shabana asked me where did I disappear ? Listening to the music of Nero's fiddle?

"I heard the sound of helicopters", I said.

"one trailing behind the other", said Shabana, "swooping low over the ruins."

I said, "It is a pity there was no hanging Christ for dumping at the Vatican."

"And no Mercello, no paparazzo", Shabana added.

We looked at each other and we were happy that with no effort we walked into the world of 'La Dolce Vita'.

"What a lovely contrast!", she said.

Obviously, Shabana meant the present-the helicopters-against Rome's 2000-year-old past.

"What a coincidence!", I quipped.

"Coincidence, you say?" She asked.

"Yes, it proves my point."

"Proves what?"

"Proves that the ruins and the helicopters are one and indivisible-a contemporary phenomenon."

Whether Shabana agreed with me or not was not important here. The fact was that we loved the dialogue we improvised, paying tribute to Fellini and 'La Dolce Vita.'

Assuming that the dialogue we improvised did neither prove a point nor did it make any sense, here I recall another time, another incident, apparently of no consequence. Apparently of no consequence, but deep within me, it was something that caught me unawares and suddenly opened the door between the past and the present.

It happened a long time ago. It was a simple incident, but not so simple to explain. (About simple facts of life Rabindranath Tagore once said in a couplet: Sahaj Katha Likhte Amai Kahaje/ Sahaj Katha Lekha Jai Na Sahaje.

Again, once, writing on the art of Nandalal Bose, Tagore said: It is not a matter to be argued, it is a matter of feeling which is why it is not that simple to write in a simple manner.

Even then let me try.

It happened at Sarnath–that great Buddhist centre near Varanasi where the Buddha having attained the Enlightenment, delivered his first sermon and turned the Wheel of Law. That was my first visit to Sarnath. That was a day in January, in 1952. And that was before I came to cinema.

At the historic site I was all alone, pacing up and down, and watching the Columns and the all-time-famous Lion Capital. Aided by a guide, I then made my way down the steps which led to the rooms arrayed in a line. Those were the rooms, I was told, where the Buddhist monks-chosen few, were housed. Walking down the alley I–then a Medical Representative of a lesser known medical firm-stood before a door, a small door, just the frame, with small opening.

"Can I go inside"? I asked the guide.

"Yes, of course", he said and made way for me.

I was taller than the door and so I bent down to walk in. And that was precisely the moment when I was suddenly caught unawares by some mysterious force I do not know what. The moment I bent down, the magic worked: I turned a monk. Believe me, I turned a monk–just for a moment. Walking in, as 1 stood straight, I returned to my own a – self dawaiwalla who could make some time free between two visits to doctor's clinics and just came here.

It was amazing, it was a ritual that I performed, a ritual that I enacted, a very simple ritual, that of bending down, with absolutely no religious compulsion and the magic worked. Just bending down which the monks at the time of the Buddha used to do as many times as they required during the day. And that was that. I did it and that was a day in January, 1952. I did it, I re-created it-a kind of re-enactment, and instantly a mysterious door opened before me–the door between the distant past and the instant present. And, without my knowing it, I attained–should I say–the enlightenment!

And this is precisely what I have been trying to say–to connect the past with the present–through two of my seemingly inconsequential anecdotes–to connect the past with the present and, in the process, to grow wiser and, through wisdom, get understanding.

"To Connect"–that is the thing.

Here, in this connection, I ask you to bear with me as I pull out a few leaves from my diary and tell you stories that meant a lot to me.

It was in 1965. It was in Dhauli, near Bhubaneswar, the capital of Kalinga, where the Emperor Asoka fought a battle, the sanguinary battle, and the last battle before he turned a devout Buddhist.

I went to Dhauli on a very specific mission. I was assigned by the Government of India to make a film on 5000 years of Indian history with an emphasis on the officially approved concept of Unity in Diversity, of continuing synthesis running through ages. To build the film I decided to go places, all over the country, and capture all that I felt I could use museum exhibits, bits from lots of historical relics, historical documents and all. Dhauli was very much in my programme.

It was all quiet in Dhauli when was arrived–my crew and I. In 1965 it was almost barren–with just one temple somewhere in the site. It was all undulations with cattle grazing and the river Daya flowing silently. In the middle of the site, on a little mound, stood the historic figure of a white elephant– the Buddha motif, and one of emperor Asoka's edicts, inscribed on a rock. That was possibly the thirteenth edict.

This particular edict, as you know, is one of Asoka's most important of all his edicts erected on rocks and pillars in different parts of his pan-Indian empire all under the Emperor's direct supervision. This, like all others, is to evidence the great metamorphosis which the all-powerful emperor went through immediately after the cruel war of Kalinga. The text, as in other inscriptions, was a kind of atonement for what the emperor considered his misdeeds and was also his pledge. "I, Priyadarshi, Beloved of the Gods....." that is how the text begins, and what follows is a claim that the king looks upon his "subjects" as his dear children, and that he who will do any offence to his "children"–officer or whoever he may be–will be punished. These and more of such sweet and assuring words form the text–all messages aimed at restoring peace among his "subjects" and to ensure, in the emperor's own words, "that people may act according to it and that it may endure for a long time". And the Emperor continues, "And one who will act thus will do what is meritorious."

I sat before the holy rock and tried to find a vantage position for the movie camera. The blazing sun and the sultry weather made us feel extremely uncomfortable. There was no vegetation around, no tree to offer us any shade.

Suddenly my eyes caught a woman, very old, skin parched, seized with infirmity–sitting a few yards apart. What business she could have there at such an awkward place and at such awkward time other than keeping an eye on the cattle grazing beyond !

I looked at her and smiled. Instantly she smiled back. It was so contagious. And the chemistry worked.

I do not remember how it worked but it did work : the door opened– the door between the past and the present–and mysteriously did I go back to the past, more than 200 years before the birth of Christ. Thus, turning into an ancient, I looked into a woman who lived in Asoka's time. It was strange but, true, I was irresistibly drawn into this strange world of Asoka, the emperor. The woman, now transformed, looked oppressed, wronged and humiliated. It was she who lived to see a monstrous war–a war that left her drained off all hopes for survival. All that she was left with were the ruins all around and blood flowing down the river Daya. Then, again, travelling a very long way and leaving the past far behind it was she, the same woman keeping an eye on the cattle and sitting at

the foot of history–the edict number thirteen–the edict that carried not a word which might have acted as a kind of constant provocation to those in Kalinga–those who survived the horrors of the monstrous war. There was absolutely no reference to the battle of Kalinga in the edict number thirteen. Strange, Strange indeed!

I returned to my own world. I came back to my own self–one who had been assigned the production of a long film which must carry a glowing sequence on Asoka's conversion to Buddhism.

And, there, a few yards away, sat the old woman, looking into me, with the holy rock and the white elephant standing solidly behind. Significantly, as you very well know, quite a number of texts elsewhere on rocks and pillars have described the "deplorable" facts of slaughter, death and deportation of thousands of people during the battle of kalinga, but, as I said before, there was no such mention in the text at Dhauli, the place of occurrence. I realised that it was a studied omission, a very deliberate omission, on the part of the Power–the Power that would eventually rule the people and the land.

But that is not the whole of my story. After completing my filming at Dhaluli I came back to Calcutta and got immediately busy with the "building" of British rule in India. One day my crew and I went to the Victoria Memorial Hall which, as you know. houses a large variety of relevant documents and exhibits.

We walked into the spacious central hall which, earlier, I visited so many times. To my shock and surprise, I almost re-discovered the historic proclamation of Queen Victoria occupying a large area in the Central Hall. It was the proclamation made a year after the inhuman massacre in 1857–when Victoria, "the Queen of England and the Empress of India" took over the governance of this vast subcontinent. I read the lines and read between the lines and I was convinced that, in spirit and in content, the Queen's proclamation was not very different from that of the Emperor Asoka.

I now, was loaded with two texts–two imperial proclamations–one made in the name of the Buddha, more than 200 years before the birth of Christ, another made in the name of Christ, more than two thousand years later–one on rocks and pillars at various strategic points throughout the vast empire stretching up to Afghanistan and, in the south, down to Madras–and another which required no such device–no rocks, on pillars, because locomotives came to India one year before the annexation. After all, and for obvious reason, with the availability of locomotives the communication machinery was far more advanced in the mid-nineteenth century than in the days of the Emperor Asoka and his successors.

And, believe me, to arrive at these wild, non-academic conclusions, or, using

another expression, to arrive at such confrontational conclusions correcting the previous ones, I did not have to make any conscious effort. The door opened mysteriously and what followed was an unceasing dialogue within me between my own time and the time of those who lived long, long years ago–between the past and the present. All that I did well within my knowledge was to invest the past with contemporary sensibility.

"To connect", as I said earlier, is the thing. I borrowed it from the English writer Forster who said it long time ago. The great Russian scholar and filmmaker Eisenstein described a fascinating process-transition from Physical Perception to Intellectual Perception. To illustrate his point Eisenstein quoted exhaustively from Tolstoy, Maupassant, Elliot,–from other arts too, and even drew examples form everyday experience you and I pass through.

(a–Clock and its two arms, b–Tolstoy's Anna Karenina, C–Maupassant's Bel Ami serve as wonderful examples).

Most importantly, Tagore said it beautifully, in his inimitable style, in his Jiban Smriti his autobiographical memoirs. It was a strange sensation, strange experience that he described. One day, very early in the morning–and that was when he was very young–he was watching the sunrise from the balcony of their Sudder Street house in Calcutta. As he was watching the sunrise, suddenly and mysteriously strange things began to unfold before his eyes. In his own words "All these days since my childhood I got used to watching things through my Chaitanya."

My bag is still stuffed with anecdotes. I just my pick–just one–one which relates to the question of "connection". I seek your indulgence.

An eminent intellectual, for whom I have got profoundest respect for his erudition, organised some official fund to go to the most backward area in the State of West Bengal and spend on the recreational programme for them. Once he put up screenings of a few films for them–the unlettered among the tribals. Several excerpts from films like Eisenstein's Battleship Potemkin and Que Viva Maxico, Satyajit Ray's Pather Panchali and Cluzot's film on Picasso were organised and shown.

The screenings according to the presenter, were a big success. True, the tribals did not have the benefit of the words spoken in the films of Ray and Cluzot, nor did they have any knowledge of the uprising of the Russians in 1905 and of Mexican history. Yet, so the presenter claimed, they understood the films. He watched them intimately as they saw the films, "wide-eyed, open-mouthed". And, as they came out after the screenings, he could clearly see "the reverence of a new experience on their faces."

The point that was made by the presenter was more or less the following.

The tribals were unlettered, raw, apparently without the least discipline. But they did follow the films, could grasp the messages captured in the films, could, in fact, "connect". And isn't it what Forster said about the understanding of art–to "connect"? To connect is the thing, it is what a writer expects his reader to do. While watching the Odessa Step sequence in 'Battleship Potemkin', the tribals could immediately "connect" the same with the battle which their forefathers had fought against the British and the Indian landlords and traders. And the very sight of the Mayan rituals in Eisenstein's 'Que Viva Mexico'-mask dance and all–made them remember their own rituals that relate to birth and death. Similarly, for reasons of their own, 'Pather Panchali' could easily touch their souls. The magic therefore, that worked was their ability to connect.

To me, all this is over–simplification. I admit the tribals saw the film "wide-eyed and open-mouthed". I shall never contest his observation when the presenter said that he could see "the reverence of a new experience" on the faces of the unlettered tribals. But what were all these due to? I am firmly convinced that the viewers in that tribal belt, in that particular situation, were awed by the 'wonder' that was cinema-multitudes of pictures appearing in quick succession and eclipsing soon after, a pair of eyes covering the whole screen, an angry crowd growing enormous and in a moment reducing itself to a small dot and a host of "marvels'' as revealed through technological performance called cinema. And, then, in *Picasso* there were colours and shapes and forms presenting a large variety of illusions for the uninitiated. All these were, indeed, great wonders not for the habitual viewers but, for sure, for those tribals who had no opportunity to watch a film before.

Here, I am tempted to recall a funny incident which Robert Flaherty, that great documentary filmmaker, described so beautifully and vividly.

Once, that was many years ago, Flaherty accompanied an Expedition team to the Arctic region. There he made contact with the head of a group of Eskimos, named Nanook. He then shot a large length of film with Nanook and his people as his subject, and came back with the whole lot of exposed material. Having edited the film and he called it 'Nanook of the North', once again Flaherty accompanied the same team to the Arctic–this time, with his edited film and a 16-mm projector. A show was organised by Flaherty for Nanook and his people. For them that was their first–and perhaps, the last-exposure to a film show–not just watching the film but also watching themselves. That was an experience which Flaherty could never forget. Nanook and his people kept watching the visuals on the

screen and, as often as they could, looked back to watch the projector. Suddenly came the sequence of the seal-hunting on the screen. Watching the sequence, there came a moment when Nanook and his people could no more remain just spectators. They grew restless, they became tense. And the moment the screen-seal, in a desperate bid to escape, rushed towards the camera, the Eskimos squatting on the floor of the improvised theatre lost not a second to jump on the screen to catch it. What followed was a big laugh, both from Flaherty and the viewers who, just at that very moment, grew wise.

Now, to conclude, Nanook's kind of ''connection" that I have just described is not really you look for. Nor do I. It is all gross, crude, just physical–and nothing more. And granting the fact that the tribals inside the make-shift theatre watched the films "wide- eyed and open-mouthed" with the "reverence of a new experience on their faces", strongly feel that the scene is just watchable, and the matter ends there. The point, as I see it, is to go beyond the physical confines and, then, chase the truth. It is a process, a journey brief or long, simple or complex. This needs to be acquired. It is a quality of mind that needs to be cultivated.

To say it in the simplest possible manner–and I warn you not to read it too literally, here is what Eisenstein prescribed. It is reading the time that is obligatory (Intellectual Perception), not just watching the two arms of a clock at an undefined angle (Physical Perception).

In other words, it is the dialectical leap that is what is our concern.

উৎস : 'ফিরে দেখা মৃণাল সেন'-
ছায়াচিত্র বিশেষ সংখ্যা, ২০০০

"I am twenty. For the last one thousand years I have been living this age of twenty. For the last one thousand years I have been passing through terrible times I have walked through poverty, squalor and death. For the last one thousand years I have been breathing despair and frustration.

And now, as I stand before you, I see ours is the history of unceasing poverty running through one thousand years and more." ***Mrinal Sen***

পোটেমকিন

মৃণাল সেন

১৯০৫!!! এক অসমাপ্ত বিপ্লবের বছর, বিপ্লবের গায়ে তখন ব্যর্থতার স্পর্শ। তবুও লেনিন ওই ব্যর্থতাকে বলেছিলেন, অক্টোবর বিপ্লবের মহড়া। তখন, প্রতিটি ব্যক্তি অবধারিত মিশে গেছে সংঘে। আর সংঘও যেন এগিয়ে চলেছে দুর্বার। শুধু এই উদ্ধৃত লাইনটাই ভেসে উঠল পর্দায়, আর কিছু নয়। পর্দায় ওই লাইন দুটি দেখে আমার শুধু মনে পড়ল ডিকেন্সের কথা। এটা ছিল একটা সেরা সময়, এটা ছিল একটা জঘন্য সময়। এটা ছিল প্রত্যাশার বসন্ত, আবার আশাহীনতার শীতও। যাবতীয় স্তব্ধতার মধ্যেই ছিলাম আমি, আর পাঁচজনের মতো। চারের দশকে কলকাতার একটি প্রদর্শনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা, পটেমকিনের। সে এক স্তব্ধতা। কারণ ১৯২৫ সালে পটেমকিনের মুক্তির বছরে ছবি তো সবাক হয়নি, হয়েছে ১৯২৯ সালে। 'হঠাৎ' (আমি ছবি থেকেই নিলাম শব্দটা। ভেসে উঠেছিল পর্দায়। নির্মম তাণ্ডব, অস্বস্তিকর নীরবতা, বিদ্রোহীদের তৎপরতার পর ফুটে উঠেছিল শব্দটা।) ঢেউ আসছে একের পর এক, তার সমস্ত অনুষঙ্গ নিয়ে। ইতিহাসে রচিত হচ্ছে এক সময়, ১৯০৫ সাল।

এই ছিল ছবির শুরু। তারপর তো সৃষ্টি হয়ে চলেছে সিনেমার মহৎ বিস্ময়গুলি, একের পর এক। আইজেনস্টাইনের নিজের ভাষায়, 'দ্রুত কাজের তাৎক্ষণিকতায়'।

আইজেনস্টাইন আমরা জানি, গসকিনো থেকে দায়িত্ব থেকে ১৯০৫ সালের ঘটনার ওপর একটা ছবি করছিলেন। সে সময়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থিরতা আর বিদ্রোহ তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। চিত্রনাট্য অনুসরণ করে কয়েকটা দৃশ্য তোলাও হল, যদিও খুব উজ্জ্বল আলোয় সেসব দৃশ্য তোলা যায়নি। আইজেনস্টাইন খুব উদগ্রীব হয়ে চাইছিলেন, আবহাওয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল হোক, লোকেশনটাও হোক ঝকঝকে। কীভাবে যেন তিনি পৌঁছেও গিয়েছিলেন ওডেসায়। আইজেনস্টাইনের নিজের কথায়, 'আমি বিশ্বাস করি প্রকৃতি, পরিবেশ, শ্যুটিং-এর সময়কার ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক মিলেমিশে এমন একটা কিছুর সৃষ্টি হয় কখনও কখনও, যা লেখক ও পরিচালকের মেধা, বুদ্ধি, বিবেচনা, দক্ষতাকে ছাপিয়ে যায়'।

প্রতিটি দৃশ্য তোলার সময় এক অনুপ্রাণিত আত্মনিবেদনই কি গড়ে দিয়েছিল ছবিটির অবিশ্বাস্য সৌভাগের ভিত? নাকি সম্পাদনার সময়কার কারিকুরিই নিয়েছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। জ্যা লেইদার কথায়, সমস্ত গবেষকদের কাছেই যা একই সঙ্গে প্রামাণিক ও যন্ত্রণাদায়ক, 'চূড়ান্ত কাটাছেঁড়া করার সময় পোটেমকিন ছাড়া আর সবকিছুই তো বাদ পড়েছিল। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছিল চলচ্চিত্র কাঠামোর এক নিখুঁত, অনবদ্য সংহত দৃষ্টান্ত।'

এসব সত্ত্বেও পোটেমকিন কিন্তু কোনো

দুর্ঘটনাজাত শিল্পকর্ম নয়। কুলেশভের কথা অনুযায়ী বলা যায়, 'ইচ্ছা, ধারাবাহিকতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির ফসল হল পোটেমকিন'। কুলেশভের কথার সঙ্গে ফেলিনির বিবৃতির কী অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য মিল এই প্রসঙ্গে। উদ্ভাবনীশক্তি বিষয়ে বহুকথিত পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজের স্বভাবসুলভ অধৈর্যেই ফেলিনি বলেছিলেন, 'এইসব কথাবার্তা বা গালগল্প খুবই বোকাবোকা। অপ্রস্তুতির মধ্যে থেকে এমন উদ্ভাবনীশক্তি দেখানো কি অতই সোজা নাকি, বরং আমি তো মনে করি অসম্ভব। ছবি তৈরি করা আসলে সবদিক দিয়েই একটা গাণিতিক তৎপরতা। শিল্প তো বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে উদ্ভাবনীশক্তি বলতে আমরা বুঝি, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, ছবিটা দেখার সময় চোখ আর কান ঠিকঠাক খোলা রাখা, যা কিছু হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের এক প্রখরতায়। আগে যা লেখা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাসের ও আনুগত্যের অন্ধত্ব রক্ষা করাটা নেহাতই বোকামো। সেটার মধ্যে উদ্ভাবন নেই কোনও। আমি একবার বা দুবার নয়, বহুবার দেখেছি পোটেমকিন। অন্যের ক্ষেত্রেও দেখেছি, আমারই মতো, যতবার দেখা ততবারই যেন অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি। একটার পর একটা দৃশ্য আসে আর যায়, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ। একটা কাহিনী কী অদ্ভুতভাবে সারা পৃথিবীকে টলিয়ে দেয় কী শব্দহীনতায়, কী আশ্চর্য দ্রুততায়।'

পোটেমকিন-এ যাদু আছে যেন, যাদু লুকিয়ে আছে প্রতিটি দৃশ্যের গভীরে, প্রতিটি ঘটনার অন্তরালে, প্রতিটি ডিটেলের গর্ভে। যেমন,

সার্জেনের ডান্ডিছাড়া চশমার ফাঁকে বন্ধ হয়ে আসা চোখ দিয়ে দেখা মাংসের দৃশ্য।

ওই চশমার দৃশ্য, যেন নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের এক প্রতীক, নষ্ট মাংস খেতে নাবিকদের আপত্তি,

তাদের ক্রোধের নির্মাণ দৃশ্য,

কড়াইতে পচা মাংসের স্যুপ ফোটার দৃশ্য, থালায় লেখা, 'আমাদের আজকের রুটি দেওয়া হোক', অবাধ্য নাবিকদের আড়াল করা সেই সাদা আচ্ছাদন, অফিসারের হুকুমে রাইফেল তুলে ধরার দৃশ্য,

অফিসারটির হুকুম 'ফা-য়া-র',

ভাকুলিনচুকের আবেগদীপ্ত আহবান, 'ব্রাদার্স', রাইফেলের নল এবং কামানের মুখ নামিয়ে আনার দৃশ্য, বিদ্রোহের দৃশ্য,

ভীত অফিসারগুলো ও যাজকের দৃশ্য,

ওই কাপড়ের আচ্ছাদনই যখন স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে গেল, সেই দৃশ্য, একটি তারে ডান্ডিহীন সেই চশমাটি খুলে থাকার দৃশ্য;

প্রতিশোধের দৃশ্য,

ভাকুলিনচুকের মৃত্যুর দৃশ্য,

তাঁর শরীরের ওপর সেই লিখনটির দৃশ্য, এই মৃত্যু কীসের বিনিময়ে,

উত্তেজনায় ভরপুর মানুষের স্রোতের দৃশ্য,

ওডেসার ভ্রাতৃত্ববোধের দৃশ্য,

ভাকুলিনচুকের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্য, পর্দায় যখন সৈন্যদের ছবি ভেসে উঠছে, সেই দৃশ্য, যেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের পাগুলো, একই ভঙ্গিমায় উদ্যত তাদের রাইফেলের দৃশ্য, জনতার বিশৃঙ্খলার দৃশ্য, গ্রামের দৃশ্য, এলোপাথাড়ি গুলির দৃশ্য, অমানবিক সেই হত্যালীলার দৃশ্য, মানুষের

দৌড়নো, পড়ে যাওয়া, গড়াতে থাকা, পা হীন এক প্রতিবন্ধীর হাতের ভরে দৌড়নো, বুলেটে নিহত মা, যাঁর বাচ্চা তখনও প্যারামবুলেটরে, আরেক মা যাঁর আহত কন্যা তখনও কোলে, সৈন্যদের বুলেটে ক্ষতবিক্ষত কাচ, সবার অজ্ঞাতে প্যারামবুলেটরটির গড়িয়ে পড়া সেই শিশুটি, রাইফেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া, বিভ্রান্তি এবং নৈরাজ্য, ভদ্রতা-অভদ্রতা,

'এবং হঠাৎ'

তিনটি সিংহের দৃশ্য, পোটেমকিনের প্রত্যুত্তর, জন্ম, সংঘাত, ছন্দ, ছন্দপতন, আলো, ছায়া, ফ্রেম, আবছায়া, বৈপরীত্য, রহস্য, স্থিরতা, 'নাইট অব সাসপেন্স', এইসব অজস্র দৃশ্যমালা ছাড়াও অন্যদিক থেকে ব্যর্থ এক বিপ্লবের ট্রাজিক পরিণতিকে অস্বীকার করতে চাওয়ার মধ্যে, ইতিহাসকে অতিক্রম করতে চাওয়ার স্পর্ধার মধ্যেও কি নেই সেই যাদু। কল্পনার জগতে সে কি এক আশ্চর্য উড়ান নয়। ওই বিদ্রোহী যুদ্ধজাহাজটি যেন এক অদ্ভুত অন্বেষণে চলে, বিজয়ীর ভঙ্গিমায় চলে। যেন তার একটাই পরিচয়, পোটেমকিন। এক নির্বাক যুগের ছবি হলেও, পোটেমকিন দেখতে বসে কিন্তু শব্দ শোনা যায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক কলরোল। যেন বাঙ্ময় এক নীরবতা প্রতিটি ফ্রেমের প্রান্তে, প্রান্তরে, বাহিরে।

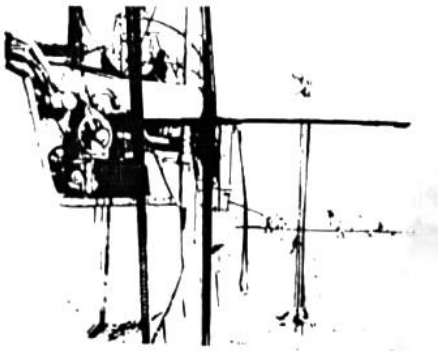

১৯২৫ সালে তৈরি হয়েছিল পোটেমকিন। অথচ এখনও দেখতে বসলে রহস্যঘেরা জগতে পরিক্রমার উপলব্ধি আসে মনে, যেন সেই জগৎ আমাকে দিচ্ছে কেবলই নতুন থেকে নতুনতর কিছু ভাবনা, প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে।

কিন্তু, আপনি কে, কী আপনার পরিচয়। আপনি কি সিনেমার জগতের কোনো কর্মী, কিম্বা শিল্পের অন্য কোনো মাধ্যমের? আপনি কি খুবই শিক্ষিত একজন দর্শক শুধু?

যাই হোন, সেটা তো কোনো ব্যাপার নয় এক্ষেত্রে। আমি পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম মহৎ একটি ছবির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমার স্বীকার করা উচিত, কয়েকবার দেখার মধ্যে মাত্র একবারই আমার পোটেমকিন দেখতে বসে অস্বস্তি হয়েছে। ছবিটাকে যুগোপযোগী করতে গিয়ে শোস্তাকোভিচ যখন ছবির মধ্যে শব্দ আর সঙ্গীত জুড়ে দিয়েছিলেন, তখন, তখনই। কোনো সন্দেহ নেই, সময়োপযোগী করার সেই প্রয়াস ঘটেছিল আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর পর।

উৎস: 'আইজেনস্টাইন জন্মশতবর্ষ' ছায়াচিত্র বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৮

মরীচিকার বাসিন্দা - মৃণাল সেনের 'পরশুরাম'

অমিতাভ নাগ

১৯৭৮ সালে মৃণাল সেন পরিচালনা করেন 'পরশুরাম' ছবিটি। এ ছবি করার প্রসঙ্গে মৃণাল বলেন, "June of 1977! My team and I were in Telengana– filming Oka Oorie Katha. That was the time when a new government came up in the state of West Bengal– the government of the Left. Hopes mounted– so did excitement. But the leaders in power had no magic wand with them to work miracles... Alongside, new problems continued to pile up. Slowly and steadily, hopes were belied. In the meantime, a friend of mine– Subhendu Mukhopadhyay, gave me a big file, a cyclostyled copy, which he collected from his anthropologist brother– Sudhendu Mukhopadhyay. It was a comprehensive study of the pavement dwellers of the big city... the script was reality and fantasy inextricably entwined – about a landless farmer coming to the city during the lean period between ploughing and harvesting– and now in search of a place on the pavement, and, in the process– fighting in darkness and fighting with darkness–a kind of shadow–boxing hitting a huge sand bag– many times larger than him."

'পরশুরাম' মৃণালের স্বল্পচর্চিত ছবির মধ্যে অন্যতম। এই নিবন্ধে আমরা এই ছবিটি বিষয়ে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করব কেন মৃণালের চলচ্চিত্রপঞ্জিতে এই ছবি গুরুত্বপূর্ণ। '৭০র দশকের প্রথমার্ধে মৃণাল রচনা করেন তাঁর 'কলকাতা চতুষ্টয়'- 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'কলকাতা ৭১' (১৯৭২), 'পদাতিক' (১৯৭৩) ও 'কোরাস (১৯৭৪)। এর মধ্যে 'কোরাস' আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে কারণ এই ছবিটি অন্য তিনটির তুলনায় গঠনের নিরিখে কিছুটা অন্যরকমের । এখানে অতিবাস্তব (কাল্পনিক মহানগরের নির্মিত সেট) এবং বাস্তব (যথার্থ লোকেশনে শুটিং) মিশে থাকে অচ্ছেদ্যভাবে । ছবির শেষে সেই তিরিশ হাজার মানুষের মিছিল বর্ণালী বিচ্ছুরণের মতো ভিসুয়াল বিভ্রমে প্রায় কার্নিভালের চেহারা নেয় যখন, তখন তা এক প্রলেতারিয়েত স্বপ্ন হয়ে যায়। মৃণাল একদা মন্তব্য করেছিলেন যে 'কোরাস'—এর শেষে তিনি একটি সম্মিলিত ফ্যান্টাসির মাধ্যমে নিপীড়নের শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোরাসকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, আশাবাদের আবহে। স্বভাবতঃই এই ছবিতে ব্রেখটিও রাজনৈতিক নাটকের প্রভাব অনস্বীকার্য থেকেও ছবিটি শেষ বিচারে একটি 'এবসার্ড', আধুনিক, মার্ক্সীয় আখ্যান যেখানে এককের নয়, সমষ্টির সমস্যা এবং নিরসনের সম্ভাবনা/স্বপ্নই ছবির প্রকৃত দৃষ্টিকোণ।

কলকাতার মধ্যবিত্তীয় মানুষের জীবনালেখ্য ছেড়ে 'কোরাস' এর পর মৃণাল রচনা করেন 'মৃগয়া' (১৯৭৬) ও 'ওকা উড়ি কথা' (১৯৭৭)।

'কোরাস'এর পর 'মৃগয়া'য় মৃণাল তাঁর আগের দশকের কিছু ছবির লিনিয়ার ন্যারেটিভ গঠনশৈলীতে চলে যান। বলা বাহুল্য ফর্ম নিয়ে এই নিরন্তর যাতায়াত বাংলা তথা ভারতীয় ছবিতে এর আগে বা পরেও বিশেষ কেউ করেন নি। মৃণালের মুন্সিয়ানা এই যে সরল লাইন টেনে ছবি করে তিনি বক্তব্যের গভীরে ঢুকতে পারেন, লাইন ভেঙে বিন্যাসের উপক্রমকে বারবার ছড়িয়ে দিয়ে কল্পিত প্রত্যয়কে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন প্রতীকের সংকেতময়তায়, পরবর্তীতে লাইন টেনে আবারও গল্পের মাধ্যমে অভীষ্টে পৌঁছতে সক্ষম হন। 'কলকাতা চতুষ্টয়' এ স্থান কলকাতা, কাল সমসাময়িক, ভাষা বাংলা, বর্ণ সাদা কালো। 'মৃগয়া'র স্থান উড়িষ্যা, যদিও তা ভারতবর্ষের যে কোনো আদিবাসী প্রত্যন্ত গ্রামও হতে পারে, কাল '৩০'র দশক, ভাষা হিন্দি, বর্ণ রঙিন। এই উল্লম্ফন আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ এটাই যে মৃণাল তাঁর চলচ্চিত্রজীবনে এই কাজটি নীরবে অনেকবার করেছেন, এবং ধ্বজা না উড়িয়েও, সাফল্যের সঙ্গেই। কিন্তু সিনেমার গঠন এবং রূপ বারংবার ভাঙতে ভাঙতেও অতীতের সিনেমাটিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্নও থেকে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। তাই 'মৃগয়া'র অন্তিম শটে ঘিনুয়ার ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর যখন গ্রামবাসীরা দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তা যেন 'কোরাস'—এর শেষে শহরের মেহনতি মানুষের সঙ্গে গ্রাম্য আদিবাসীদের কোথাও এক শাখায় নিয়ে আসে। কিন্তু 'কলকাতা চতুষ্টয়'এ সিনেমার চতুর্থ দেওয়াল ভেঙে ফেলে যেভাবে বিভিন্ন চরিত্র ক্যামেরার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সেভাবে না হলেও 'মৃগয়া'র শেষে পরিচালক যেন সেই কাজটিই করতে চান যখন আদিবাসীদের উর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে পর্দায় ফুটে ওঠে "Stand Up, Stand Up. Remember the martyrs who loved Life and Freedom".

পরের ছবি 'ওকা উড়ি কথা' প্রেমচন্দের 'কফন' গল্পের ওপর। এ ছবিও প্রান্তিক গ্রামের মানুষের ওপর, উত্তরপ্রদেশের পটভূমিতে কাহিনি, মৃণাল তাকে তেলেঙ্গানায় এনে ফেলেন। কিন্তু শোষণের রূপটি এখানেও প্রবল, প্রকট ও দ্ব্যর্থহীন। মনে রাখতে হবে যে ১৯৬৮তে 'মুভিং পার্সপেক্টিভস' তথ্যচিত্র করার সময় মৃণাল সেন সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। সেই যাত্রাপথে তিনি দেশের সাধারণ মানুষদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি বুঝতে পারেন গভীরভাবে। তাই তার পরবর্তীতে মৃণালের ছবির দেখানোর আঙ্গিক পাল্টে গেলো। এবং 'কলকাতা চতুষ্টয়' কলকাতা মহানগরকে কেন্দ্র করে হলেও তার ভিতর দিয়ে বারংবার ফুটে বেরিয়েছে যে শোষণের বীজ প্রোথিত আছে আমাদের গ্রামের দেশে। কৃষিভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে গ্রাম থেকে শহরের অন্তঃপ্রবাহ অর্থনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় যার মূলে থাকে নিপীড়নের ইতিহাস, শোষণের গল্প, শিল্পায়নের খতিয়ান। যে শোষণ-নিপীড়ন জমিদার-জোতদারের মাধ্যমে গ্রামে হয়, সেই একই অবিচার শহরে ভিন্নভাবে অনুঘটিত হয়- মধ্যবিত্তের ওপর করে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্তের ওপর মধ্য ও উচ্চবিত্ত, উভয়ই। শোষণের কারণ যখন অর্থনৈতিক, তখন তার প্রকাশের রূপ পাল্টে গেলেও তার উদ্দেশ্যর পরিবর্তন হয় না। তাই 'কলকাতা চতুষ্টয়'র পরেই মৃণাল কলকাতা ছেড়ে চলে যান প্রান্তিক মানুষদের কাছে, 'মৃগয়া' ও 'ওকা উড়ি কথা'য়।

উল্লেখ্যনীয়, ভারতের জনগোষ্ঠীর শোষণের চিত্র অনুসন্ধানে মৃণাল শহর থেকে গ্রামে গিয়েছেন, সাদা-কালো থেকে রঙিনে, তথ্যচিত্রীয় ভঙ্গি থেকে একরৈখিক চলনে, মধ্যবিত্তীয় শহুরে থেকে নিম্নবিত্তীয় নিঃস্ব মানুষদের কাছে। এবং এর সঙ্গে তিনি বদল এনেছেন তাঁর চলচ্চিত্রীয় ব্যাকরণেও। কেবলমাত্র ক্যামেরার কম্পোজিশনাল বৈশিষ্ট্যেই নয়, বদলে গেছে মৃণালের ক্যামেরার চলন এবং এডিটিংয়ের ভাষাও। indiancine.ma ওয়েবসাইটে দেখা যায় 'ইন্টারভিউ' ছবির Cuts per minute সংখ্যা ৩৫.৯৯৭, 'পদাতিক'এ ২৯.৫৬৬, 'কোরাস'এ ৩৫.৪১০। 'মৃগয়া'তে তা কমে হয়ে যাচ্ছে ৬.৬৪২, 'ওকা উড়ি কথা'য় ৭.৮৩৪। শক্তি বা বিশৃঙ্খলা প্রকাশের বিষয়ে উদগ্রীব পরিচালক পরে যেন আরেকটু স্থিত, শান্ত।

কেন 'পরশুরাম'?

১৯৭৭ সালে তাঁর 'The Flounder' নভেলে সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস লিখেছিলেন "There are no separate slums, or bustees, in Calcutta. The whole city is one bustee, or slum, and neither the middle nor the upper classes can segregate themselves from it." স্বাভাবিকভাবেই কলকাতাপ্রেমীর বড় অংশ এহেন সরলীকরণে বিস্তর চটেছিলেন। কিন্তু নোবেলজয়ী সাহিত্যিকের কথাটা তলিয়ে ভাববার মতো। কলকাতার বস্তিবাসীর জনসংখ্যা ১৯৬১ সালের সেন্সাসে মোটের ২২% যা কুড়ি বছরে বেড়ে হয় প্রায় দ্বিগুণ, মোটের ৪১%, ১৯৮১ সালে। এই বর্ধমান প্রক্রিয়ার মধ্যেই গুন্টার কলকাতা পরিক্রমা করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার ক্রমবর্ধমান বস্তিবাসী তাঁর চোখ এড়ায় না। এর পাশাপাশি আরেকটি তথ্যও আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে পারে। মার্চ - জুন ১৯৮৭ কে.এম. ডি.এ (কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) একটা সার্ভে করে বার করেন যে কলকাতায় ৫৫,৫৭১ ফুটপাথবাসী বাস করেন।

ফুটপাথের বাসিন্দাদের বিষয়ে ভাবতে গেলে, প্রথমেই যেটা বোঝা দরকার তা হলো এদের প্রায় সকলেরই কোনো ফিরে যাওয়ার জায়গা নেই। কিংবা থাকলেও সেখানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীণ। তারা শহরে আসছে কারণ শুধুমাত্র এখানেই তারা রোজগার করে টিকে থাকার কথা ভেবে অনির্দিষ্টকাল থেকে যেতে পারে। তাদের আদি উৎপত্তিস্থলে তুলনামূলক পরিমাণ উপার্জন করানো সম্ভব করতে পারলেই একমাত্র তাদের শহর থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। কঠোর আইন-শৃঙ্খলা প্রণয়ন তাদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে বড়জোর, কিংবা কখনো সখনো পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচিত লুকোচুরিও খেলতে হতে পারে। পরশুরামও ঠিক এরকমই একটি দৃশ্যে পুলিশের গাড়ি এসে কয়েক ঘর ফুটপাথবাসীকে উৎখাত করে দেয় অবলীলায়। ছবির নায়ক পরশুরাম একটু দূর থেকে পুরো বিষয়টি দেখে। বোঝা যায় এই সাপ-লুডো খেলা একটি আপাত নিরীহ, নিয়মিত ঘটনা। সেই ফুটপাথবাসীরা পরেরদিনই আবার তাদের অস্থায়ী 'ঘর' পুনরায় রচনা করে ফেলে। অতএব, তাদের পুনর্বাসনের মূল সমাধান হল গ্রামবাংলার সর্বনিম্ন স্তরে দারিদ্র্য হ্রাস করা যা এক অত্যন্ত দুরূহ এবং সম্ভবত প্রকৃতই অসম্ভব কাজ।

মাথায় রাখতে হবে অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে এক ফুটপাথবাসী কিন্তু একজন বস্তিবাসীর থেকেও নিচুতে অবস্থিত। বেশিরভাগ বড়ো শহরে এমনকি কলকাতাতেও বস্তিবাসীদের জন্য বিবিধ প্রকল্প কার্যকর করানো হয়, বা চেষ্টা করা হয়। সব অর্থেই ফুটপাথের বাসিন্দা শহরের দূরতম বোঝা, অযোগ্য বাড়তি। জীবিকা অর্জনের জন্য তার কোন বিশেষ দক্ষতা নেই, নিছক শারীরিক শ্রম তার একমাত্র সম্পদ। তার জীবন চিত্রিত করে প্রায় সব ধরনের নিঃস্বতা, প্রাকৃতিক বা ব্যক্তিগত বিপর্যয়, অসুস্থতা এবং অকাল মৃত্যু। প্রায় সারাজীবনই সে দারিদ্র্য-রেখার নিচে বসবাস করে এসেছে যার ফলে একদিন সে বড় শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়াকেই সম্ভাব্যময় ভবিষ্যৎ ভাবতে বাধ্য হয়। এই ভূমিহীন অতিরিক্তের শহরে আগমন প্রাথমিকভাবে তাকে অসহায় হীনমন্যতার অনুভূতিতে স্তব্ধ করে দেয়। যে শোষণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশায় সে আসে কলকাতায়, তার চেয়ে আরও সুতীব্র শোষণযন্ত্রে সে চিরতরে পিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যায়। শহরে তার কোনো স্থায়ী আস্তানা হয় না, উপড়ে যাওয়া যাযাবর মানুষটি গ্রামে কাজ না পেয়ে পরিযায়ী পাখির মতো শহরে ছুটে এসে হয়তো ফুটপাথে একচিলতে জায়গা অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে বা মিলেমিশে মীমাংসা করে আশ্রয় হিসেবে সনাক্ত করতে পারে বড়জোর।

'পরশুরাম' ছবির আলোচনায় এই দীর্ঘ উপক্রমণিকার কারণ আছে। মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রাকাশে 'ভুবন সোম' (১৯৬৯) যেমন একটি পর্বান্তরের সূচক, প্রায় এক দশক পরের 'পরশুরাম'ও অনেকাংশে তাই—ই। এর আগে মৃণাল শহুরে মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে ধরতে চেয়েছেন, অন্ত্যজদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন তাদের স্বগ্রাম স্বজনে। কিন্তু এই প্রথম মৃণাল দেখতে চাইলেন গ্রাম থেকে অর্থনৈতিক কারণে উৎপাটিত, শহরের রাজপথে উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরেকে। যে চ্যাপলিনকে নিয়ে মৃণালের এতো উচ্ছ্বাস, এই প্রথম বোধহয় সেই চ্যাপলিনের মতো এক ভবঘুরেকে নির্মাণ করলেন মৃণাল। না, আমোদ, পরিতোষের কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে না। পরশুরামও চ্যাপলিনের ভবঘুরের মতো নিঃসঙ্গ কিন্তু ভাবনাহীন, স্নেহের যোগ্য এবং স্নেহময়ও। এই বিশাল শহরে পরশুরাম একা, তাকে চলে আসতে হয় পেটের তাড়নায়। কিন্তু তাকে লালন করে এক অপরাজিত বোধ। তাই আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের মতো পরশুরাম চিন্তাক্লিষ্ট নয়, সে সাধারণতঃ মেঘমুক্ত, পরিষ্কার।

একাধিকবার মৃণাল সেন মন্তব্য করেছেন যে তিনি কৃষক বা শ্রমিকদের যে অবস্থান সেটি বুঝতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর নিজের শ্রেণী পরিচয় অতিক্রম করে তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশা গভীরভাবে বুঝতে পারেননি। হয়তো সেকারণে অন্ত্যজ বা উদ্বাস্তু বহিরাগতের গল্প নিয়ে ছবি করতে গিয়ে প্রায়শঃই ('মৃগয়া' ও 'পরশুরাম'—এ, যদিও 'ওকা উড়ি কথা'তে নয়) তিনি সহানুভূতিশীল, কিছুটা অনুকম্পার দৃষ্টি থেকে ব্যাকুল। তাই তাঁর এই নিম্নবিত্তীয় চরিত্রসমন্বিত ছবি সমূহে মৃত্যু এতো গুরুত্বপূর্ণ- 'মৃগয়া'তে ঘিনুয়া, 'ওকা উড়ি কথায়' নিলাম্মা, 'পরশুরাম'—এ পরশুরাম, এমনকি 'খারিজ' এ বালক চাকর পালান। মৃত্যুর মাধ্যমেই মৃণাল হয়তো তাঁর মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং বিদেশী

দর্শককে সচেতন করার চেষ্টা করেন কীভাবে সেই দর্শকশ্রেণিই এই মৃত্যুকাণ্ডে নীরব পৃষ্ঠপোষক হয়ে যায়। 'পরশুরামও তাই এপিসোডিক খন্ডগুলো পরশুরামের অভ্যন্তরীণ সংকটগুলোর থেকেও বেশি জোর দেয় পরশুরামের ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায় অবিচারের মূল্যবোধে। তাই শুরুতেই উচ্চবিত্তের অপমানে পরশুরামের বিপ্লব শুধুই কল্পনায়, ছায়ার সঙ্গে, অন্ধকারে। অল্প পরে গঙ্গার ঘাটে সম্ভ্রান্ত ধনীর পয়সা বিতরণ ও নিম্নশ্রেণীর মারপিট করে তা কুড়োনোয় পরশুরাম বুঝে যায় ''বাবুদের খেলা, আমাদের যুদ্ধ''।

'মহাভারত' এবং পুরাণে পরশুরাম বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার যিনি ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়দের বিনাশে নিযুক্ত থেকেছিলেন। বিষ্ণুর আরেক অবতার কৃষ্ণ, যিনি জগন্নাথও। চীন ঔপন্যাসিক লু জিনের নভেলা 'The True Story of Ah-Q'র (১৯২১) ওপর ভিত্তি করে ১৯৭৭ সালে চেতনা নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'জগন্নাথ' নাটকটি যা বাংলা থিয়েটারের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। অরুণ মুখোপাধ্যায় নির্দেশনা দিয়েছিলেন, অভিনয়ও করেছিলেন মুখ্য চরিত্র জগন্নাথের ভূমিকায়। সেই অরুণ মুখোপাধ্যায়ই যখন পরশুরামের চরিত্রে অভিনয় করেন এবং সেই ছবির একটি নির্দিষ্ট সাবপ্লট লু জিনের নভেলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তখন তা এক উল্লেখযোগ্য সমাপতনই বটে, বা হয়তো সাহিত্য-থিয়েটার-চলচ্চিত্রের অন্তরসম্পর্কের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণও। তবে অরুণ জগন্নাথকে গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে বের করেননি, মৃণাল তাঁর রাজনৈতিক বীক্ষায় পরশুরামকে শহরের উদ্বাস্তু করে দেন। কিন্তু মজা হচ্ছে, 'মহাভারত'এর পরশুরাম নিষ্কৃতি চাওয়া প্রতিকারের এক সর্বোত্তম প্রতীক। কিন্তু মৃণালের ছবির নায়ক একজন নীরব দর্শক যে প্রায়শঃই নিজেকে অদৃশ্যমান করে ফেলে যে কোনো শক্তির সামনে। তাই সে লুকিয়ে পড়ে দেখতে থাকে যখন ফুটপাথের বাসিন্দাদের পৌর কর্তৃপক্ষ তাড়িয়ে দেয়। পৌরাণিক এবং বাস্তবের মধ্যে এই বিদ্রূপাত্মক বিচ্ছিন্নতাই মৃণালের আখ্যানের চালিকাশক্তি। বস্তুতঃ, পরশুরামের কুঠারটি আমরা একবারই ব্যবহৃত হতে দেখি যখন আহ্লাদী বলে মেয়েটি পরশুরামকে ছেড়ে চলে যায়- পরশুরাম আক্রোশে তার কুঠারটি দিয়ে আহ্লাদীর সাধের একটি রঙিন বাক্সকে ভেঙে ফেলে। বাড়ি এবং পরিবার গড়ার যে স্বপ্ন পরশুরাম দেখেছিল সেটার ধ্বংসের এ এক প্রতীকী উপস্থাপনা। লু জিনের গল্পের অনুষঙ্গে পরশুরাম বারবার উল্লেখ করে যে কীভাবে সে গ্রামে তার কুঠারটি দিয়ে একটি বাঘকে মেরেছিল। সাহসিকতা এবং বীরত্বের গল্পটি যখন সে প্রথম বলতে শুরু করে এক বৃদ্ধ ভিখিরিকে তখন একটি ইঁদুরের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক চূড়ান্ত শ্লেষাত্মক প্রয়োগ যার মাধ্যমে মৃণাল মিথ ও বাস্তবের বিপরীতমুখী বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করেন। ইঁদুরের প্রসঙ্গটির পরেও একাধিকবার পুনরাবৃত্তি হয় নিম্নবিত্তীয় সামাজিক জীবনে মনুষ্যেতর জীব এবং মানুষ সহাবস্থান করে শুধু নয় উল্লেখযোগ্যভাবে একই রকম জীবন যাপনও করে।

পরিত্যক্ত নারী, নিয়ন্ত্রক পুরুষ

'পরশুরাম'এ প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আহ্লাদীর অনুপ্রবেশ ঘটে। তার অপ্রত্যাশিত আগমন আরেক কমবয়সী ফুটপাথবাসিনীর অন্তর্ধানের মাধ্যমে

সংযোজিত হয়। আহ্লাদী এই শহরে পরশুরামের আগে থেকেই আছে, পরে সেই জানায় কীভাবে তার নিজের মা তাকে চুরি করতে শিখিয়েছিল, টিকে থাকার লড়াইয়ে। আহ্লাদী এক সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে যা ''মানুষের'' মতো যেখানে নতুন, গোটা কাপড় থাকবে পরনে, খাবার থাকবে পেটে, সিনেমা দেখতে যাওয়ার অবকাশও। আহ্লাদীর স্বপ্নযাপনে মোহিত পরশুরাম নিজেও সেই স্বপ্নের শরিক হতে চায়। তাই পরে ফুটপাথবাসী হারানের কাছে সে আহ্লাদীকে তার স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে নির্দ্বিধায়। পরশুরাম আহ্লাদীর মন পড়তে পারে না, আহ্লাদী কঠিন বাস্তবের নাগরিক। সে জানে অধিকাংশ পুরুষের ভোগ-লালসার কামনা, এবং নিজের শখ-সুবিধার জন্য সে নিজের নারীত্বকে ব্যবহার করতে পিছপাও না। তাই যখন সে তার অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করে, তখন তা করে খুব স্বাভাবিকভাবেই। পুরুষের কাছে, সমাজের কাছে, জীবনের কাছে বারংবার প্রতারিত হয়ে আহ্লাদীর দুঃখ থাকলেও তার কারো বিরুদ্ধে সেই অর্থে কোনো অভিযোগ নেই। তার ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন সে অকপটেই বলে, হয়তো তা স্বপ্নই থাকবে, কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না এই অন্তদৃষ্টির কারণেই, একই স্পষ্টতায় সে প্রকাশ করে তার গর্ভস্থ সন্তানের কথা, এবং এও যে সে কারো কাছে কিছুই আশা করে না। আহ্লাদী চরিত্রটি নির্মম এক অর্থে, কিন্তু ভাবপ্রবণতারহিত- পাপ-পুণ্য, ঠিক-ভুল ইত্যাদি নৈতিকতার প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর, চুরি, আনুগত্যহীনতা তার কাছে বেঁচে থাকার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

আহ্লাদীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গুর, কিন্তু তার অভাবটি চিরস্থায়ী। আহ্লাদী শহরের আরও একাধিক ভাসমান চরিত্রের একজন। হয়তো পুরুষ চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে নারী প্রবাহমান, কারণ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যম্ভাবীভাবেই পুরুষ, তার নৈতিকতার ধ্বজা নিয়ে। তাই আহ্লাদীর জীবন বয়ে চলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক পুরুষ থেকে ভিন্ন পুরুষে। এক সকালে পরশুরাম ও বৃদ্ধ ভিখিরি আবিষ্কার করে তাদের সঞ্চিত টাকা নিয়ে আহ্লাদী উধাও হয়ে গিয়েছে। রাগে ফেটে পড়ে পরশুরাম কিন্তু কিছু পরেই আহ্লাদী ফিরেও আসে, এক ঝুড়ি জিনিস কিনে। পরশুরামের কাছে যা গেরস্থালির হাতছানি, আহ্লাদীর কাছে তা অন্য এক জীবনবোধ যে, পরশুরামের সঙ্গে কবরস্থানের ধ্বংসের মধ্যে তার এই অস্থায়ী গৃহ স্থাপনের ব্যাপ্তি ওই একটি ঝুড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এই সংসারে তার ইচ্ছে গুলো কোনোদিনই চরিতার্থ হতে পারবে না। রাতের অন্ধকার চিরে মোটরবাইকের আওয়াজ শোনা যায়। কে বা কারা ওই রাতের অন্ধকার, ওই মৃত কবরের আত্মার ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। হয়তো সেরকম কোনো মোটরবাইকেই উঠে পড়ে আহ্লাদী, কিছুদিনের জন্য তার স্বপ্নের সংসারের মিথ্যের আশ্রয়ে। সিনেমায় তার আগে দেখা ফুটপাথবাসী যুবতী যে এক অন্ধ ভিক্ষুকের মেয়ে, সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই মেয়েটিও কোথাও আহ্লাদীর মতো স্বপ্ন দেখে হয়তো, তার এক প্রেমিক আছে যাকে আমরা কখনো দেখিনা, কিন্তু যার সাইকেলের বেলের আওয়াজ আমাদের জানান দেয় তার উপস্থিতির কথা। মৃণাল দেখাতে চান, রাতের অন্ধকারে এই ভাবেই হয়তো উন্নত জীবনের উদ্দীপক আকাঙ্ক্ষায় যুবতীরা অবিরত চলনে প্ররোচিত হয়। এবং এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যৌন

ভায়োলেন্স এবং লিঙ্গ-শোষণের প্রচ্ছন্ন হুমকি যা তাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

এখানে দুটি অন্য ছবির অবতারণা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়তো। প্রথমটি ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি, তক্কো, আর গপ্পো' (১৯৭৪)। এই ছবিতে নির্বাসনের অনিবার্য অবস্থায় নীলকণ্ঠ, নচিকেতা ও বঙ্গবালা, এই তিনজন - দুটি ভিন্ন বয়সের পুরুষ ও একটি যুবতী, একটি বাড়ির আশ্রয়ের জন্য মরিয়া অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকলে আমরা বুঝতে পারি ক্রমশঃ যে এখানে অনুসন্ধানটি আর নিছক আশ্রয় খোঁজাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, আশ্রয়হীনতাই গ্রহণযোগ্য অবস্থানের ধ্রুবক হয়ে যায়, অন্ততঃ প্রৌঢ় নীলকণ্ঠের কাছে। অবশেষে ফুটপাথটিই যেন শ্রেণী সংগ্রামের আখড়া হিসাবে উপস্থাপিত হয়। তাও বুঝতে হবে যে এই তিন চরিত্রের সকলেই মধ্যবিত্তীয় মানসিকতার। কিন্তু যেহেতু এটা মূলতঃ নীলকণ্ঠের কাহিনি অতএব বঙ্গবালার যে সংগ্রাম, নারী হিসেব তার যে শোষণের ইতিহাস তা আমরা অবগত হই না। বঙ্গবালা যেন অখন্ড বাংলার আত্মার প্রতিমা, তাই সে সাংকেতিক, প্রতীকী। সে আহ্লাদীর মতো ঘোর বাস্তব নয় যেন।

দ্বিতীয় ছবিটি মৃণালেরই 'জেনেসিস' (১৯৮৬)। এই ছবিতেও দুটি পুরুষ, তবে তারা সমবয়সী যাদের জীবনে অকস্মাৎ এক যুবতীর আগমন হয়, আহ্লাদীরই মতো। প্রথমে দুই যুবকের যেন খেয়ালই থাকে না যে এই আগন্তুক একজন যুবতী। তিন জোড়া হাতে তারা সেই জনমানবহীন মরুভূমিতে জীবিকার চেষ্টা শুরু করে। বঙ্গবালা, আহ্লাদীর মতো এই যুবতীরও একটি অতীত আছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মৃত্যুর সেই বিগত জীবন থেকে সেও পালাতে চাইছে। কিছুদিন পরেই যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সে বলতে পারে না কার সন্তান তার গর্ভে। সে বুঝতে পারে না কেন এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই দুই পুরুষকে যেন জানতেই হবে আসন্ন সন্তানের পিতা কে, গর্ভজাত সন্তানের উপর কার অধিকার। এই যে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ম যার বশবর্তী হয়ে দুটি যুবকই যুবতীর গর্ভের মালিক হতে চায় তাতে তাদের সর্বহারার চেতনাকে ছাপিয়ে এক গভীরে প্রোথিত সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার প্রকাশ পায়। যুবতীটি প্রত্যয়ের সঙ্গেই যুবক দুজনকে বলে যে সে বলতে পারবে না সন্তানের পিতা কোন জন কিন্তু সে জানে যে সন্তানটি তারই গর্ভের, তার নিজের। অতঃপর, আমরা সেই দুই যুবককে দেখতে পাই, যারা উৎপত্তির গোড়া থেকে শ্রমের সমষ্টিতে একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু এই চলচ্চিত্র আখ্যানের শেষে এসে অযৌক্তিক বিদ্বেষে একে অপরকে আঘাত করতে বাধ্য হয়। এই যে গর্ভের ওপর অধিকার কায়েমের সংস্কার তা আমরা 'পরশুরাম'-এও দেখি। আহ্লাদী বৃদ্ধ ভিক্ষুককে জানায় তার জীবনের কিছু কথা, তার স্বামী, তার প্রেমিক যে তাকে গর্ভবতী করেছে, পরশুরাম আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে আক্রোশে ফেটে পড়ে বলে 'নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকারে'। পরে সে নিজেকেই আশ্বস্ত করে প্রবোধ দিয়ে বলে ওঠে 'তুই আমারে মিছে কথা কয়েছিস'। অর্থাৎ, যে আহ্লাদীর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কও না, যাকে সে প্রায় নতুন দেখছে, যার গর্ভসঞ্চার হয়েছে তাদের পরিচয়েরও আগে সেখানেও পুরুষ কর্তৃত্ব কায়েম করতে উদগ্রীব।

ধ্বংস ও শহর

মৃণালের চলচ্চিত্রে ধ্বংসাবশেষ একটি স্থায়ী

প্রতীকী রেফারেন্স। সেই 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০) এ যদি দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙ্গনের স্বরূপ দেখান মৃণাল তার পর তাঁর একাধিক ছবিতেই ধ্বংস এক পুনরাবৃত্তিমূলক বাস্তব। 'জেনেসিস'র পরিত্যক্ত গ্রাম, 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮০) এর জমিদারবাড়ি বা 'খন্ডহর' (১৯৮৩) এর বাড়িটিও। কিন্তু অন্য ছবির মতো এখানে ধ্বংসাবশেষ কোনো বিবর্জিত এলাকায় অনাদরে পড়ে থাকা না, এ মহানগরীর একেবারে মধ্যে, কবরস্থানে। গ্রাম থেকে শহরে এসে 'বাবুদের' বাড়ি থেকে মিথ্যে চোরের অপবাদ নিয়ে যখন পরশুরামের ফুটপাথেও জায়গা হয়না তখন সে এই ধ্বংসরূপ কবরখানায় মাথা গোঁজার জায়গা পায়। জ্যান্ত মানুষদের সঙ্গে আশ্রয় ভাগ করে নিতে না পারলেও পরশুরাম মৃত মানুষের সঙ্গে স্থান ভাগ করে নিতে পারে, সেখানে জায়গা 'বিলি হয়ে' যায় না।

ছবির একটি সাবপ্লটে একটি চোরাচালানকারী দল কবরস্থানটিকে তাদের গুপ্ত কাজের জন্য নিরাপদ জায়গা হিসেবেই ব্যবহার করে। মজার বিষয় হল তারা পরশুরাম ও আহ্লাদীর উপস্থিতি প্রায় উপেক্ষা করে, তাদের কোনো উপদ্রব বলেই ভাবে না, মনুষ্যপদবাচ্যই নয় যেন, যাওয়ার সময় একটা শাড়ি ছুঁড়ে দেয় অবজ্ঞা করে। পরশুরাম ও তার শ্রেণীর মানুষ একক হিসেবে প্রশাসন অথবা অপশাসন সবার কাছেই অদৃশ্যসমান, একমাত্র যখন তারা সমষ্টি হিসেবে একটা বড় সংখ্যা তখনই তারা অসুবিধাজনক, শহুরে সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

ফুটপাথবাসীদের জন্ম এবং মৃত্যুর বৃত্ত ফুটপাথেই অতিবাহিত হয়। সেখানেই একটি শিশু প্রসব হওয়ার পর ভয়েসওভারে একটি সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায়। 'জাতীয় বাস্তু সম্মেলন'এর এক বৈঠকে শোনা যায় -''খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার ফুটপাথের বাসিন্দা দুঃসহ জীবনযাপন করছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিক ও বিশেষভাবে শাসকশ্রেণীর পক্ষে এই গুরুতর সমস্যা উপেক্ষা করা নির্লজ্জ অপরাধ। আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং আধুনিকতার প্রেরণায় শহর ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে, সুসজ্জিত হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই প্রগতির প্রশংসা করেই কি আমরা এড়িয়ে থাকতে পারি এই অগণিত দুঃস্থ মানুষের যন্ত্রণা? কৃষিব্যবস্থার সংকট, ভূমিহীন চাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি, শ্রমের তুলনায় কম উপার্জন, জমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস, নিয়ত খরা, বন্যা ও মড়কের তাণ্ডব— এ সব কিছুর তাড়নায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষেরা গ্রাম থেকে উৎখাত, নির্বাসিত। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তারা আছড়ে পড়ছে মহানগরীর পথে, ঘাটে। এরা আসছে আর মরছে আধি, ব্যাধি আর ক্ষুধার জ্বালায়। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে সৌধমালায় শোভিত মহানগরীর আধুনিক অঙ্গসজ্জার নৈতিক মূল্য কতটুকু? ইট পাথর আর কংক্রিটের গাঁথুনিতে নগরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। কেবল ভাষণ, ভাষণ আর ভাষণের বাক্য-ছটাতেও নগরী তিলোত্তমা হয়ে ওঠে না। আমাদের শপথ নিতে হবে, নতুন করে উদ্বুদ্ধ হতে হবে নবজাগরণে উদগাতা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে চেতনার নতুন দিগন্তে তখন জেগে উঠবে বিংশ শতকের মহানগরীর মোহনীয় মূর্তি।'' পুরো সিকোয়েন্সটাই ডকুফিচারধর্মী যেখানে ভয়েসওভারের সঙ্গে পর্দায় রাস্তায় ভিক্ষা করা বা বসবাসকারীদের অকথ্য জীবন যাপন দেখানো হয়। কিন্তু গভীরে ভাবলে বোঝা যায় যে সমাজে দারিদ্র্য ও নিপীড়নের প্রকৃতি নিয়ে এ নিছকই শহুরে

বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামি। এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ সাংস্কৃতিক আইকন নিয়ে মধ্যবিত্তের অসভ্য ব্যস্ততাকে জ্ঞাপিত করে।

অন্তঃকথন

এই ছবির বেশ কিছু চিত্র আমাদের হয়তো মৃণালের অন্য প্রখ্যাত ছবিকে মনে করাবে ইঁট বের করা দেয়ালে বাঁধা পড়া আহ্লাদী 'খন্ডহর'- এর যামিনীকে; এক যুবতীর বাড়িতে না ফেরা যা 'পরশুরাম'-এ আহ্লাদী ও ফুটপাথবাসিনীর সাবপ্লট তাহ 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৭৯) এর মূল বিষয়; পরশুরামের বাঘ শিকারের আপাত অবাস্তবতা আমাদের 'ভুবন সোম'-এ সোমসাহেবের পাখি শিকার মনে পড়ায়; শুরুর বালক মাদারী কোথাও যেন 'খারিজ'এর বালক চাকর পালান।

কিন্তু তার যশস্বী সহোদরদের সঙ্গে তার মিলের জন্য নয়, 'পরশুরাম' উল্লেখযোগ্য আমার কাছে কারণ তা মৃণালের এক নতুন সন্ধিক্ষণের ছবি। এর মাধ্যমেই মৃণালের নায়ক গ্রাম থেকে আবার শহরে ফিরে আসে। হয়তো পরশুরাম ঘিনুয়ার মতোই কেউ যে ভীরু পায়ে কলকাতায় এসে নগরীর বিষক্রিয়ায় শেষমেশ মারা যায়। বা সে হয়তো পালানেরই যুবক রূপ। পরশুরামের মৃত্যুর পর আহ্লাদী দেখা করতে এসে তার কুঠারটি হাতে তুলে নেয়। কিন্তু, এই উত্তরাধিকারের মধ্যে কোনো বিপ্লবের পুনর্জন্ম নেই। চিতায় শায়িত পরশুরামের নিথর দেহটি আমাদের মহানাগরিক ঔদাসীন্যের অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল না। আমাদের মধ্যবিত্তীয় আগ্রাসনে সহস্র পরশুরামের মৃত্যু নিছকই পরিসংখ্যান সারণীতে কিছু সংখ্যা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। ১৯৭৭এ নতুন বামপন্থী সরকারের দিকে আশার চোখে তাকিয়েও মৃণাল নির্মাণ করেন 'পরশুরাম'এর মতো তমসাঘন ছবি। সাড়ে চার দশক পর শোষণের চিত্রটি উত্তরোত্তর বেড়েছেই হয়তো। কিন্তু বাংলা ভাষার সিনেমা তৈরির কারিগরদের হয়তো পরশুরাম, নিদেনপক্ষে রাশিবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানগুলোও চোখে পড়ে না আর। সবকিছুর উর্ধে সময়ের দলিল হিসেবেই সে কারণে ভাবী কাল হয়তো 'পরশুরাম'কে মনে রেখে দিতে চাইবে।

(অনুষ্টুপ শারদীয় ২০২৩-এ প্রকাশিত)

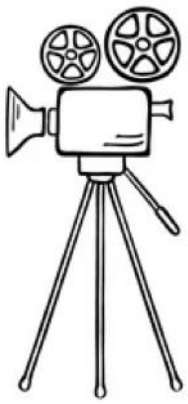

পাশ থেকে দেখা

গীতা সেন

সেটা '৪৬ সাল হবে। আমার বয়স তখন ১৬ বছর। আমাদের উত্তর পাড়ার বাড়িতে খুবই অসুস্থ অবস্থায় বাবা একদিন বারান্দায় বসে আছেন, এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে আমরা চিনি, তিনি একটু আধটু গান চর্চা করেন।

সেই ভদ্রলোক বাবাকে বললেন– একটা গ্রুপ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার, তারা একটা ছবি করছে। তাতে পনেরো-ষোল বছরের মেয়ের একটা চরিত্র আছে, যদি আপনার মেয়ে করে সেটা.....

প্রথমে তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের বাড়ি থেকে সিনেমা করার কথা ভাবাই যেতনা। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বাবাকে বললেন– গ্রুপের লোকেরা একদিন আসবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। একটা কথা আমি বলতে পারি এঁরা সবাই নতুন আর সবাই খুব ভাল। পরে একদিন সকাল ন'টা বা দশটার সময় জনা পাঁচেক ভদ্রলোক এলেন। তার মধ্যে সকলেই মোটামুটি চল্লিশ পার করা মানুষ। একজনই একটু যুবক। ওঁরা কথাবর্তা বলে চলে গেলেন। সেই যুবকই মৃণাল সেন। উনি কি করে সেই দলটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। 'দুধারা' বলে যে গল্প নিয়ে ছবিটা হচ্ছিল, সেটা ছিল মৃণালবাবুর লেখা। ঘটনাটার একমাসের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন। তখন ওঁরা আবার এলেন আমাদের বাড়িতে। ওঁদের পরামর্শে এবং অনেকটা সংসার চালানোর জন্যই আমি ছবিটাতে অভিনয় করতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে দলের সকলের সঙ্গে পরিচিতি হল। তখনই বুঝতে পারতাম আমি যেমন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছি, মৃণালবাবুও তাই। সবার চেয়ে ছোট বলেই হয়ত দলের সবাই খুবই ভালবাসত। কিন্তু অচেনা জগতের মধ্যে নতুন আমি খুব কাঁদতাম। ওটাই তখন ছিল আমার অভ্যাস।

তখনই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন রিহার্সাল চলতে রাত প্রায় আটটা হয়ে গেল। ভবানীপুরে একটা বাড়িতে রিহার্সাল হত। রোজ রাতে ফেরার সময় দলের কেউ আমাকে হাওড়া যাবার বাসে তুলে দিতেন, কিন্তু বাসে উঠলে কেউ আর সঙ্গে থাকত না। আবার হাওড়া স্টেশনে দাদা বা কাকা কেউ অপেক্ষা করতেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সাতটা বারো-র একটা ট্রেন ধরে ফিরতাম আমরা। সেদিন অত দেরি হয়েছিল বলেই দলের সবাই বললেন—চল গীতা ভ্যানে করে আমরা তো যাচ্ছিই, তোমাকেও হাওড়া পৌঁছে দিয়ে আসি। স্টেশনে যখন ভয়ে ভয়ে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ শুনি পিছন থেকে– 'দাঁড়ান', তাকিয়ে দেখি মৃণালবাবু। আমাকে বললেন– আজ এত রাতে আপনার লোক কি কেউ থাকবে– রাত সত্যিই অনেক হয়েছিল এবং কেউ ছিল না। তখন উনিই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম ওঁর মধ্যে একটা সহানুভূতি ছিল।

অন্য সময়েও দেখতাম উনি আমাকে বেশ প্রোটেকশান দিতেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মধ্যে প্রেমের কথা, প্রেমের চাওয়াচায়িটা

ছিল না। একটা মেয়ে বড় অসহায়, তাকে খানিকটা সাহায্য করা। এরকমই ছিল ব্যাপারটা। পরে অবশ্য দুই পরিবারের লোকেরা মিলে আমাদের বিয়ে ঠিক করলেন।

বিয়ের আগে চিঠিতে নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। ওঁদের অবস্থাও তখন খুবই খারাপ। কখনও কখনও আমাদের বাড়িতেও যেতেন এবং অর্ধেক দিনই হেঁটে যেতেন। 'দুধারা' ছবিটা শেষ পর্যন্ত রিলিজ করেনি। তার পরেই আমি নাটকে এলাম। বিজন ভট্টাচার্যের মরা চাঁদ', 'নীল দর্পণ', 'জ্বালা', 'বিসর্জন' এইসব এবং আরো কিছু নাটকের মধ্যে দিয়ে পরিচয় হলো বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেন, উৎপল দত্ত, মৃণাল সেনতো ছিলেনই। ওঁদের আড্ডা ছিল মৃণালবাবুদের বেকবাগানের বাড়িতে। উত্তরপাড়াতেও আমাদের নাটকের একটা গ্রুপ ছিল। সেখানেও মৃণালবাবু, তাপসবাবু গিয়ে ঐ দলটাকে নিয়ে নাটক করতেন। আমরা তখন গ্রামেগঞ্জে নাটক করে বেড়াতাম। তখন মৃণাল সেন পকেটে ছবি তৈরির বাজেট নিয়ে ছবি করার চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু ছবি তৈরির উপায়টা আর হয়ে উঠত না।

এমনকি নিজের বাড়িতে আর আমার বাড়িতে কিছু আলাদা টাকা পাঠাবার জন্য কিছুদিন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করতে শুরু করেন লক্ষ্ণৌ চলে গিয়ে। কিন্তু সেখান থেকে লেখা চিঠিতে ওঁর ছবি করার ইচ্ছেটা বুঝতে পারতাম। আমার বড় কষ্ট হত। শুধু এই ক'টা টাকা পাঠানোর চেষ্টায় এত যে ছবি করার ইচ্ছে, এটা একবার যদি অন্যদিকে ঘুরে যায়, হয়ত আর পারবেন না, কিংবা খুব কষ্ট পাবেন। চিঠিতেই বুঝতে পারতাম ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। আমিও চিঠিতে লিখতাম, আমার ভয় করে যদি আর ছবি না করতে পারো। তাই বলতাম ফিরে এস, এসে চেষ্টা কর, একেবারে বেরিয়ে যেওনা।

তারপর ফিরে আসেন। আর ১৯৫৩য় আমাদের বিয়ে হয়। তখনই একদম সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। ফলে পাঞ্জাবীটা তাপসের, ধুতিটা অমুকের, এমনভাবেই বিয়েটা হয়ে যায়। এরপরই ওঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর'। আমরা তখন অশ্বিনী দত্ত রোডে একটা বাড়িতে থাকতাম। ছবির টাকা তখন পাওয়াও যায়নি আর ছবিটার কথা এখন বলতেও চান না। কারণ ওটা করে ওঁর নিজেরই মনে হয়েছিল 'সাংঘাতিক খারাপ, ছবি করতে আমি জানিনা'। ফলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। এই সময়েই আমাদের ছেলের জন্ম হয়। ওকে তখন যে ফুড্‌টা দু'বারে খাওয়াবার কথা, বাধ্য হয়েই সেটা আটবারে ভাগ করে খাওয়াতাম।

সেই সময়েই একটা সময় আমি ওঁকে প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্যে দেখেছিলাম। না খেয়েও ইয়ার্কি করার একটা অভ্যাস ওঁর ছিল। কিন্তু একদিনের মত ভেঙে পড়তে আমি কোনদিন দেখিনি। সেদিন মাঝরাতে এমনকি বাচ্চাটাকে বাড়িওয়ালাদের কাছে রেখে দুজনে আত্মহত্যা করার কথাও উঠেছিল। আমি বলেছিলাম– কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি বিয়ে করেছিলাম, তা একথা শোনার জন্যে নয়। যেভাবেই হোক্ বাঁচতে হবে, একথা যে চিরকাল বলে এসেছে হঠাৎ তার মুখে মৃত্যুর কথা আমি মানতে পারিনি। পরে অবশ্য সে সব কেটে যায়। তারপর আবার ছবি করার সুযোগ পান প্রায় আড়াই বছর পরে– নীল আকাশের নীচে। ছবিটা ভাল লাগে বহু মানুষের। কিন্তু মৃণাল সেন খুব একটা খুশী হননি। তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'

বছরখানেক বাদে। আমার মনে হয়, ''আমি ভাল ছবি করতে পারি'' এই বিশ্বাসটা ওঁর এলো। এই 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে। তবু কিন্তু অর্থাভাব মোটেই মিটল না। তাই বেঁচে থাকার লড়াই অনেক অনেকদিন থেকেই গেল।

একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। চার পাঁচদিন ধরে আমরা কেউ ভাত খাইনি। টুকটাক খেয়ে চলছে। বাচ্ছা টাকে অবশ্য উপরে বাড়িওয়ালারা দু'বেলা দুটো খাইয়ে দিতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজেই বললেন, 'গীতা, আজকে যেরকম করেই হোক একটু চাল যোগাড় করব।' বলে চলে গেলেন, তারপর রাত ন'টা আসেনই না। আমার হিটারে আমি জল একবার ফোটাচ্ছি আবার হিটার অফ্ করে রাখছি। এলেই চাল ধুয়ে ফেলে দেব। একটুও দেরি না হয়। হঠাৎ বেল বাজালেন। গেলাম।

কিচ্ছু পারলাম না গীতা। কাউকেই ধরতে পারলাম না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। কিছুটা খই নিয়ে এসো। জলে ভিজিয়ে নরম করে খাওয়া যাবে।

মুড়ি চিবোনোর মত অবস্থাও তখন ছিল না। উনি চলে যাবার একটু পরেই ওঁদের বন্ধু নৃপেন গাঙ্গুলী এসে ওঁর খোঁজ করলেন। বেরিয়েছেন বলতেই তিনি অবাক–

আরে কি মুশকিল! একটা জমাটি আড্ডা হচ্ছিল দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে। বলল এই টুক করে একবার বাড়িটা ঘুরেই আসছি। আমি, কালীদা, ঋষিদা, ঋত্বিকদা এখনও অপেক্ষা করছি মোড়ের মাথায় ওঁর জন্যে।

ফিরে আসার পর সে কথা বলতেই অমনি বললেন 'সর্বনাশ'। এটাই ওঁর চরিত্র। ভেঙে পড়ার লোক নয়। এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলতে চলতে 'ভুবন সোম' করার পর আমাদের জীবনের প্রচণ্ড অসুবিধেগুলো একটু একটু কমতে থাকল। আমরা একটা বাড়িও পেলাম। মতিলাল নেহেরু রোডের একটা বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলাম।

ওঁর ছবিতে আমার প্রথম অভিনয় 'কলকাতা ৭১'- এ। চাল বিক্রি করে যে ছেলেটি, স্মাগলার তার মায়ের রোলটা করেছিলাম। সেটা করার পর আবার করলাম 'একদিন প্রতিদিন'। সত্যি কথা বলতে কি আমাকে 'একদিন প্রতিদিন'-এ একেবারে চিন্তা করেননি। আমি যে করব এটা নিয়ে বাড়িতে কোন আলোচনাও হয়নি। অন্য কাউকে কাউকে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন নাটকের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রীকে ফোন করেছিলেন। এক মা ও তার মেয়েকে নিয়ে গল্পটা শুনে জানতে চান মা ও মেয়ের মধ্যে কোন্ রোলটা বড় বা কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট চরিত্র। তখন উনি বলেছিলেন, না আমি এরকম করে কখনও বলতে পারিনা। ছবি করতে গিয়ে কি দাঁড়াবে তা আমি এখনও বলতে পারিনা। আমার মনে হয় আপনার না করাই ভাল। খোঁজাখুঁজি করে কাউকে না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমাকে নিলেন। পরে অবশ্য সেই অভিনেত্রী ফোন করে আমাকে বলেছিলেন, সেদিন যদি মৃণালবাবুর কথায় রাজি হয়ে যেতাম তবে আপনার মত একজনের অভিনয় আমি দেখতে পেতাম না। তাঁর কাছ থেকে এরকম একটা প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে একটা মস্ত বড় কথা।

'৭২ সালে 'কলকাতা ৭১' ছবিতে অভিনয় করার আগে অবশ্য আমি আবার নাটকে অভিনয় করতে আরম্ভ করেছিলাম '৬৪ সাল নাগাদ। আমার ছেলের বয়স তখন ১০ বছর, আমি উৎপল দত্ত-র

'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে' 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' নাটকে অভিনয় করি। তারপর আরও ৬ বছর বিভিন্ন নাটকে যেমন, 'ওথেলো', 'কল্লোল', 'তীর' ইত্যাদিতে অভিনয় করি।

মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একথা আমার মনে হয়েছে বয়স যখন অল্প ছিল টেনশন তখনও ছিল। কিন্তু মানুষ যখন বুঝতে পারে তার দায়িত্ব বাড়ছে, একটু সুনাম হয়েছে, তার কাছে মানুষ ভাল কিছু চায়- তখন তার ওপরেও প্রত্যাশার চাপ বাড়ে। তখন থেকেই আমি দেখতাম কাজ করার সময় ওঁর চরিত্র ভীষণ বদলে যেত। এমনকি স্ক্রিপ্ট লেখার সময় থেকেই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যায়। আগে আগে কখনও দীঘায় বা এম. এল. এ. হোস্টেল বা হোটেলরাজ-এ একটা ঘর নিয়ে তিন থেকে চারদিনের মধ্যে স্ক্রিপ্ট করে ফেলতেন। ইদানিং অবশ্য স্ক্রিপ্টটা এখানেই করেন। দেখেছি ওঁর মাথায় সবটা থাকে। পুরো স্ক্রিপ্ট কখনো করতেন না। একটা আন্দাজমত কিছু ওঁর করা থাকত। তারপর শ্যুটিং করতে করতে বাড়ত। কখনও দেখা যাবে শ্যুটিং-এর সময় বাড়তি পাতা যোগ হচ্ছে। এভাবেই বাড়তে থাকে। শ্যুটিং সেরে বাড়ি ফিরেও আবার রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত ওকে লেখাপড়া করতে দেখেছি। আর এইসব অদল বদল চলতে থাকার সময়ে বা কোন স্ক্রিপ্ট এমনকি চিঠি লিখে হলেও সবসময় আমায় বা আমার ছেলেকে কিংবা অন্য কাউকে পড়ে শোনাবেনই।

'ভুবন সোমের' সময় মোটামুটি একটা স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনানোর পর আমি প্রথমে বলেছিলাম ওটা ছবি হয়না, ওরকম একটা ছবি করলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ছবি করতে করতে প্রচণ্ড অদল বদল করেছিলেন। আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, গীতা আমি প্রচুর পাল্টাচ্ছি কিন্তু এত সময় নেই যে সব ডিটেলস্ লিখব। আমার মনে হয় এখন আর তুমি বলবে না যে এ ছবি করলে বাড়ি থেকে চলে যাবে।

তাছাড়া কাকে কোন চরিত্রে নেওয়া যাবে এসব নিয়েও সবসময় আলোচনা করতে উনি ভালবাসেন। বিশেষত মেয়েলি ব্যাপারটা উনি কোনদিনই তেমন জানতেন না। মা, বৌদি, বোন সবার মধ্যে থাকলেও পড়াশোনা, বেরনো, আড্ডা, বন্ধু এসব নিয়ে সংসারের ভিতরটায় উনি তেমন ঢোকেননি। কাজেই যখনই কোন ঘরোয়া আবহ তৈরির কথা থাকে তখনই আলোচনা করেন, যেমন 'খারিজ'। ওতে ওঁর একটা চিন্তা ছিল বন্ধ ঘরের মধ্যে উনুন জ্বালা অবস্থায় রাত্রিবাস করে ছেলেটি যে মারা যাবে এটা হবে কি করে? আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কাজ শেষ হবার পরও ঘরে উনুন জ্বালিয়ে রাখা, এটা কি তোমরা কর? আমি বললাম কখনো করিনা। উনুনের আগুন খুঁচিয়ে নিচে ফেলে ঢিমে আঁচে একটা কড়াই বা কিছুতে করে খানিকটা জল গরম বসিয়ে রাখি। যাতে ফুটে গেলেও তাপটা জল নিয়ে নেয় অন্য কোথাও আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে না। পরে আবার একদিন জিজ্ঞেস করলেন কি করে আগুনটা রাখা যায় বল তো। তখন আমি বললাম অনেক সময় আমরা শেষ উনুনে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি করে সাবান ফোটানোর জন্যে জামা কাপড় ভিজিয়ে রেখে দিই। কুচো কয়লা দিয়ে আধ ঘন্টার মেয়াদী আগুন তৈরি করে তাতে সাবান কাচার এই ব্যবস্থাটা 'খারিজ'-এ কাজে লাগিয়েছিলাম। মমতাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল উনুনে কি ছিল ডেকচি বসান দেখলাম। তখন মমতা বলে যে একটু জামাকাপড় ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

অভিনেত্রী হিসেবে শাবানাও খুব সাহায্য করে। ময়লা শাড়ি পরা, পুকুরধারে থাকা গ্রাম্য মেয়ের পেটিকোট যে ধপ্‌ধপে ফরসা হয় না এটা সবসময়েই ওর খেয়াল থাকে। 'খণ্ডহর' করার সময় বোলপুরের লোকেশানে স্থানীয় মেয়েদের দেখেই আটপৌরে কাপড পরা রপ্ত করে এসে ও আমায় দেখিয়েছে। পরে দেখেছি ঐরকম শাড়ি পরার বাঙালি ভঙ্গিটা আয়ত্ত করে ও কি দারুণ কাজে লাগিয়েছে ছবির মধ্যে। বাড়িতে থাকার সময় কাপড়ে একটু ঢিলেঢালা ভাব থাকে। কিন্তু দাদা আর তার বন্ধু এসে যেই নীচ থেকে নাম ধরে ডেকেছে অমনি সে আঁচল এবং কোমরের কাপড় পরিপাটি করে নিতে নিতে দরজার দিকে এগোয়। আমিও মা'র চরিত্রে অভিনয় করার সময় এরকম সাধারণ ব্যাপারগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করেছি। আমি দেখি অনেক ছবিতেই মা রান্নাঘরের মা হলেও তার এতখানি চুড়ি পরা হবে। একটা বড় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হবে, তার কাপড়টা মাড় দেওয়া হবে। সব মিশিয়ে একটু হলুদলাগা আটপৌরে মা'কে আমরা পাই না। পা ঢেকে শাড়ি পরে ঐ মায়ের চরিত্রটা হয়ে ওঠা যায়না বলে আমার মনে হয়েছে। আমি আমার জা, আমার দিদি, কাজের লোক মঙ্গলা এঁদের কাছ থেকে শাড়ি সংগ্রহ করেছি, চায়ের - লিকারে ডুবিয়ে ব্লাউজের একটা চেহারা এনেছি আবার কথাবার্তা চলাফেরার অ্যাটিচুডেও আমার দেখা - মায়েদের মত হতে চেয়েছি। আমার শাশুড়ি, মা, কাকিমাদের যেমন দেখেছি আমার ইচ্ছে ছিল ঠিক তেমনটাই হয়ে উঠব। যে মায়ের অতবড় ছেলে বা বা অতবড় মেয়ে তার চেহারার আদলটা ধরার জন্য অভিনয়ের সময় আমি অন্তর্বাস ব্যবহার করিনি, পিঠের কাপড় পুরো ফেলে রেখেছি। এক কথায় আমি অনেক জেনুইন হতে চেয়েছি। মৃণালবাবুও এটা মেনে নিয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন। বলেছেন, দেখো আমি দেখি মা অনেক সময়েই যুবতী মা। কেন তা হবে? অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রাখলেও মেয়েলি ব্যাপারগুলো একটু ওঁর চোখ এড়িয়ে যায় বলেই সম্ভবত আমার ওপর এক্ষেত্রে নির্ভর করেন।

জনৈক প্রযোজক একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেবল রাজেশ খান্নাকে নিয়ে একটা ছবি করলে ওঁকে ৫ লাখ টাকা দেবেন। এমনকি তাঁর কথা শুনে একদিন রাজেশ খান্না নিজেই ফোন করে ফেললেন। কিন্তু ছবিটা উনি করেননি। করতে চাননি বলেই। আর তার পরেই নিজের - মনে মনে কেমন কুণ্ঠাবোধ করেছেন। একদিন দুপুরে খাবার সময় আমাকে আর আমার ছেলেকে প্রায় জবাবদিহির ভঙ্গীতে বললেন, ''ছবিটা করলাম না, - তোমরা হয়ত ভাবছ অনেকগুলো টাকা পাওয়া যেত।'' শুনে আমরা তো অবাক। আসলে প্রচুর পরিমাণ স্বচ্ছলতা আমাদের দিতে পারেন নি বলে একটা আক্ষেপ ওঁর মধ্যে তৈরি হচ্ছিল। আমার ছেলে অবশ্য বলল, ''বরং ওরকম একটা ছবি করলেই আমাকে অন্য কারোর বাড়ি গিয়ে উঠতে হত।''

এইটাই মৃণাল সেন, ওঁর মনোজগতের এই চেহারাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই এতদিন ওঁর সঙ্গে চলতে কোন অসুবিধা হয়নি।

উৎস : 'ফিরে দেখা মৃণাল সেন'-
ছায়াচিত্র বিশেষ সংখ্যা, ২০০০

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র ও চলচ্চিত্র উৎসব— তিন দশকের ধারাবাহিকতা

সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়

তিল তিল করে তিন দশকের তিলোত্তমা— হ্যাঁ কথাটার মধ্যে ইংরেজি ভাষার alliteration বা বাংলা ভাষার অনুপ্রাস থাকলেও hyperbolic বা অতিশয়োক্তি নয়। অন্তত তাঁদের কাছে তো নয়ই যারা তিলোত্তমা তৈরি করেছে বা করার চেষ্টায় রত আছে। বর্ধমানের মত গ্রামীণ জেলা শহরে দেশী বিদেশী রুচিশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও তা নিয়ে চর্চা—আলোচনার পরিসর তৈরি করার জন্য তিল পরিমাণ মানুষ, তিল পরিমাণ আর্থিক সংগতি নিয়ে তিন দশক আগেই একটি সংস্থার পথ চলা শুরু করান। বর্ধমান শহরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে ও চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশকল্পে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে তৈরি হয় ''বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র''। মাঝখানের তিন দশকে বিশ্বায়ন— আর্থিক সংস্কার—কেব্‌ল টিভি --- মোবাইল --- ইন্টারনেট --- সামাজিক মাধ্যম—করোনা, এই একটার পর একটা প্রবল ঝড় 'তিলোত্তমা' তৈরির পথে 'ক্ষুরস্য ধারা' বিস্তার করে রেখেছিল। আর বিশেষভাবে ছিল ও ব্যাপকভাবে আছে প্রযুক্তির কন্টক। এই necessary evil—এর বিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রবল। প্রযুক্তি বারবার, যারা এই তিলোত্তমা নির্মাণে 'প্রযুক্ত' তাদেরকে প্রাণপণ বাধা দিয়েছে দু'ভাবে। প্রথমত প্রযুক্তির নিয়ত পরিবর্তনশীলতা—উন্নত থেকে উন্নততর কিংবা ভিন্ন থেকে ভিন্নতর—বারবার চলচ্চিত্রকে পর্দায় উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সংস্থা হয়েছে বিভ্রান্ত। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতা বা Mutability ছোটো সংস্থার উপর আর্থিক অবরোধ বা embargo জারি করেছে। উনিশ শতকের ম্যাজিক লণ্ঠন থেকে আজকের ডিজিটাল ফরম্যাট একটা quantum leap। একটা ডিজিটাল ছবি বিভিন্ন উপায়ে সিনেমায় বিতরণ করা যেতে পারে। সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভের যুগ ছাড়িয়ে ইন্টারনেট বা ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট লিঙ্কের মাধ্যমে বা হার্ড ড্রাইভ বা ব্লু-রে ডিস্ক বা এইচ.ডি.ডি.—র মতো অপটিক্যাল ডিস্কের যুগে চলচ্চিত্র পৌঁছে গেছে। এর সঙ্গে আছে প্রযোজকের, পরিচালকের কপি রাইট বা মেধাস্বত্ত্ব। তাঁদের হাতেই থাকে ছবি খোলার চিচিং ফাঁক পাসওয়ার্ড। ফলে প্রযুক্তিগত প্রযত্নে সব ছবি প্রদর্শন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো, সাধারণ মানুষের কাছে কম খরচে প্রযুক্তি, করতলে আমলকিবৎ হয়ে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহমুখী মানুষকে প্রেক্ষাগৃহ বিমুখ করে দিয়েছে। আবার কে যাবে, সান্ধ্য জলবৎ তরলং সিরিয়াল ছেড়ে বুদ্ধির কসরৎ করা 'দুর্বোধ্য' ছায়াছবির 'হায়ারোগ্লিফিক পাঠোদ্ধারে'? ফলে এই 'যেতেও কাটা আসতেও কাটা' পরিস্থিতির মধ্যে একটা ফিল্ম সোসাইটি গত তিন দশক ধরে চলমান থাকা খুবই চ্যালেঞ্জের। আর কষ্টের জিনিস তো কষ্টকারীদের কাছে 'তিলোত্তমা' হবেই!

তাই তিন দশক ধরে চলা এই সংস্থা সদস্যদের কাছে বেশ গর্বের; আবার আশঙ্কারও বটে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে বহন করে নিয়ে যাবার ভার আস্তে আস্তে দুঃসহ হয়ে যাচ্ছে । পাশাপাশি এই সংস্থা আয়োজিত ' বর্ধমান আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র উৎসব', নয় নয় করে রজত জয়ন্তী বর্ষে পা দিল। 'বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের signature programme. সমগ্র বর্ধমানবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে একাদিক্রমে এই উৎসব চলে আসছে। কালান্তর কোভিড—১৯ও উৎসবের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি। আজকের উৎসব নানা কারণে কিছুটা অনুজ্জ্বল হলেও এর ইতিহাস আলোকোজ্জ্বল। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নির্দিষ্ট দিন ছিল ১০ই নভেম্বর থেকে ১৭ ই নভেম্বর। ঠিক তার দু-এক দিন পরেই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষঙ্গ হিসাবে আমাদের উৎসব হতো। উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা উৎসবের বাছাই করা কিছু ছবি সদর থেকে মফস্বলে দেখান। বর্ধমান ও শিলিগুড়ি এই দুই জায়গায় উৎসব চলত। মিলত কিছু সরকারি অনুদান। উৎসাহ -- আগ্রহাতিশয্যে সে উৎসব ছিল প্রাণময়। ছবি দেখাবার প্রজেক্টার মেশিন আসত কলকাতা থেকে। কলকাতা উৎসবের signature tune এখানেও প্রতিটি ছবির আগে দেখানো হতো। সব মিলিয়ে কলকাতার দুধের স্বাদ ঘোলে নয় দুধেই মিটত। সংস্কৃতি মঞ্চের বাইরে চারিদিকে আলোর রোশনাই। থাকত প্রদর্শনী কিংবা ছবির কাট আউট। জিলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, পৌরসভা সবার অকুণ্ঠ সহযোগিতা এখনকার মতো তখনও ছিল। সাত দিনের উৎসবকে ঘিরে সদস্যদের ছিল অসীম উৎসাহ। কলকাতা থেকে আসতেন বহু বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব। বরাবর এই উৎসব ছিল গাম্ভীর্যে ভরপুর, আভিজাত্যে ঋদ্ধ, শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত ও সাবেকিয়ানায় দৃঢ়। প্রথম থেকেই এক নান্দনিক শুচিতা এই চলচ্চিত্র উৎসব বহন করে এসেছে। সেই ধারাবাহিকতা আজও চলছে।

তবে 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়' — তেমনি পরিবর্তনের স্রোত সব কিছুকেই ভাসিয়ে দিচ্ছে। ফিল্ম সোসাইটি সমাজ বহির্ভূত কোন বায়ুভুক জীব নয়; নানা বাধা, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা এসেছে। সমাজের চালচলনে নানা পরিবর্তন এসেছে। সর্বোপরি মানুষের চাহিদা, রুচি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন এসেছে। সিনেমায় মানুষ অপরজনকে দৃশ্যায়িত হতে দেখে, কিন্তু হাতের সহজলভ্য ক্যামেরায় নিজেই দৃশ্য নিজেই দর্শক। নিজেই নিজের ছবি দেখে ও প্রচার করে আত্মতৃপ্তি পায়। ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন তা ব্যাখ্যাতীত। মানুষ নিজেও খুব বিভ্রান্ত ও অস্থির। আবার বাধ্য হয়ে সে খুব হিসেবিও। অঙ্ক না মিললেও জীবন - জীবিকার চাপ তাকে অঙ্ক কষতে বাধ্য করে। ফলে আজ থেকে তিন দশক আগে কিছু 'বেহিসেবি' উৎসাহী লোক ''রইল ঝোলা চলল ভোলা'' বলে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তো আজ তা বেশ কম। ফলে উৎসব কিছুটা ম্রিয়মাণ।

D.H.Lawrence এর শেষ উপন্যাস Lady Chatterley's Lover -এর কথা মনে পড়ে "Ours is essentially a tragic age–we refuse to take it tragically..... It is rather hard work: there is now no smooth road into the future." সবচেয়ে মজার হলো আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লরেন্স এ কথা লিখেছিলেন। এই উপন্যাস নিয়ে ছবি তৈরি হয় ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু একশ বছর আগেও tragic age ছিল, আজও আছে। তার পদ্ধতি, প্রকরণ হয়তো বদলেছে। আজও tragically দেখা হয় না বলেই ২৫ বছরের উৎসবের অভিমুখ ৫০এর পানে। এভাবেই চলছে কিংবা চলতে হয়। বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রও চলছে। জগতে চলার নিয়মই হলো -

"And found and lost again and again"

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের বিগত এক বছর

বাপ্পাদিত্য দাঁ

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন, / চৈত্র অবসান/গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের / সর্বশেষ গান।'' পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির সুনির্দিষ্ট ঘূর্ণনে দিন-রাত পার হয়ে নিশ্চিতভাবে এসেছে বাংলা নতুন বছর। এবার শুধু নতুন বছরই নয়, নতুন দশক ১৪৩০। কিন্তু যে ক্লান্ত বছরকে ফেলে এলাম তার ভালো-মন্দের ছায়া-প্রচ্ছায়া আমাদের সঙ্গী। তাই ফেলে আসা বছর কি অনেকটাই ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা নয়? নতুন বছরের সাথে সেই আবর্জনা দূর হয়ে যাবে কোনো ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়, তা একদমই নয়। দিনযাপনের ও প্রাণ ধারণের গ্লানি আমাদের জীবন ও জগতে এমনভাবে পরিকীর্ণ হয়ে আছে যে শুকনো পাতার স্তূপকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো করে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ ফেলে আসা বছর জুড়ে আছে আদিগন্ত আর্বজনার স্তূপ, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা। প্রশ্ন এটাই, এই চলমান বছরেও কি আমরা জীবনকে খন্ড খন্ড করে পদে পদে নিজেরাই নিজেদেরকে খন্ডিত ও দন্ডিত করব। এ বড়ো কঠিন সময়!

এই সামগ্রিক প্রায়ান্ধকার সময়ের মধ্যে যে কোন ধরণের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা যেন সমাজে পরিহসনীয় হয়ে ওঠে। অথচ এক নির্মল সমাজজীবনই স্নিগ্ধ-শুদ্ধ সংস্কৃতির পটভূমিকা। মানুষের প্রাত্যহিক প্রাণধারণ গ্লানিময় ও ক্লান্তিময় হলে সংস্কৃতিচর্চাও যেন নিছক কিছু ড্রয়িংরুম বিলাসী মানুষের উৎকট উদযাপন বলে মনে হতে পারে। সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টি সেখানে প্রাধান্য পায়। কিন্তু ব্যষ্টি মানুষের প্রচেষ্টা তা বলে থেমেও থাকে না। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির 'সেতুবন্ধনে' তাই ছোট ছোট 'কাঠবিড়ালী'র ভূমিকা নগণ্য নয়। নগণ্য নয় বলেই তিন দশক ধরে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাকল্পে আমরা ব্রতী। তারই অনুষঙ্গ হিসাবে রুচিশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন গত তিরিশ বছর ধরে। শুধু বিনোদনের চাকচিক্য নয়, উল্কার চোখ ধাঁধানো আলোক প্রদর্শন নয়, মননশীল চর্চার ও বৌদ্ধিক মতামতের এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তৈরী করা, যেখানে স্বপক্ষ-বিপক্ষ সবাই মত প্রকাশ করে যাবেন নির্ভীক চিত্তে। আলোচনার সাথে সমালোচনা, মতের সাথে অমত—সবার কলতানে মুখরিত হবে চলার পথ। এই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আজও আছে।

অতিমারীর ধাক্কা সামলে উঠে বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের কর্মসমিতি এবছরে চেষ্টা করেছে পূর্বের ন্যায় ধারাবাহিকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। পূর্বের ন্যায় ততটা সম্ভব না হলেও অনেকটাই করতে আমরা সফল হয়েছি। আমরা বিগত কয়েকবছর থেকেই চেষ্টা করছি নানান পরীক্ষামূলক ভালো ছবি সদস্যদের দেখাতে। গতানুগতিক ছবির বাইরে ভারতসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ছবি নিয়ে যে ভাবনা চিন্তা চলছে তারই কিছুটা আমরা তুলে আনতে চেয়েছি আমাদের প্রদর্শনীগুলিতে।

ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ

ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবছর থেকে শুরু হয়েছে World Film Festival. এরই অঙ্গ হিসাবে বর্ধমানে ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ও টাউন হলে আয়োজন করা হয়েছিল 1st World Film Festival. এই উৎসবে তিনদিনে ৬টি দেশের মোট ৬টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আবু সঈদ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সহসভাপতি প্রেমেন্দ্র মজুমদার। উদ্বোধনী ছবি হিসাবে প্রদর্শিত হয় 'পায়ের তলায় মাটি নাই'। বিষয়বস্তু ও নির্মাণের গুণে বাংলাদেশের এই ছবিটি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। বর্তমান সময়ে নির্মিত বাংলাদেশের ছবিগুলো যথেষ্ট উন্নতমানের হচ্ছে। আগামী দিনে এইরকমই কয়েকটি ছবি আমরা আমাদের সদস্যদের দেখাতে পারবো বলে আশা করি। এছাড়া ইরানের ছবি 'Fathers',পর্তুগালের ছবি 'Sardina' ও ইজিপ্টের ছবি 'Fragile' দর্শকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। এই চলচ্চিত্র উৎসবটিও আগামী দিনে বর্ধমানের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করি।

বর্ধমানের সাংস্কৃতিক মানচিত্রের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ২৪ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২১-২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। চারদিন ব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসবে ছটি দেশের সাতটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী ছবি 'মহিষাসুরমর্দিনীর' পরিচালক রঞ্জন ঘোষ। জার্মানী, ইকুয়েডর, মরক্কো, কাজাকাস্তান ও ভারতের সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত ছবিগুলো এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। উৎসবের দিনগুলিতে চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি ছিল আশাব্যঞ্জক।

চতুর্থ বর্ধমান স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভবনে। এই উৎসবে ১২ জন পরিচালকের ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় নবীন পরিচালকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। ছবি প্রদর্শনীর শেষে পরিচালকদের সঙ্গে দর্শকদের পারস্পরিক আলাপচারিতার মাধ্যমে এই উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এবছর খুব কমসময়ের পরিকল্পনায় এই উৎসবটি আয়োজিত হওয়ায় বেশী সংখ্যক পরিচালকদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আগামী বছর সময় নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারলে অনেক সংখ্যক ছবি নির্মাতাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারব।

কিংবদন্তী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মদিনে (০২.০৫.২০২২) প্রদর্শিত হয় 'অপুর সংসার' ও 'রবীন্দ্রনাথ' (তথ্যচিত্র)। প্রখ্যাত পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেখানো হয় তাঁর নির্মিত 'Anand' ছবিটি।

এবছর আমরা হারিয়েছি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারকে। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ জানাই একটি ছোট স্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবং এই অনুষ্ঠানের শেষে প্রদর্শিত হয় তার নির্মিত ছবি 'নিমন্ত্রণ'।

এবছরের ছবির প্রদর্শনী আমরা শুরু করি ২০২২ সালের সেরা ছবি বিভাগে অস্কারপ্রাপ্ত 'Coda' প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। এছাড়াও প্রদর্শিত হয়

অস্কার জয়ী আর একটি চলচ্চিত্র 'Belfast' সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র বিভাগে অস্কার জয়ী ভারতীয় ছবি 'The Elephant Whisperers' এবং সেরা ছবি, সেরা পরিচালকসহ সাতটি বিভাগে অস্কারপ্রাপ্ত 'Everything Everywhere All At Once' প্রদর্শন করা হয়েছে।

দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত 'ঘরে বাইরে আজ', 'বিনিসুতোয়', 'অপরাজিত', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'মহিষাসুরমর্দিনী'র মতো বাংলা ছবি দেখিয়েছি, যা দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা ছবি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নির্মিত কয়েকটি বিখ্যাত ছবি আমরা বিগত বছরে দেখিয়েছি তার মধ্যে তামিল ছবি 'Jai Bhim', কোঙ্কনী ছবি 'Kaajro', হিন্দী ছবি 'Barah-by-Barah' দর্শকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

বাংলা, হিন্দী, আঞ্চলিক ছবির পাশাপাশি বিশ্বের নানা প্রান্তের সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত অনেকগুলি ছবি আমরা দেখিয়েছি। World Film Festival, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ছাড়াও অস্কারজয়ী ছবির প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের ছবি আমাদের সদস্যদের দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি সারাবছরই পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির সাথে বেশ কয়েকটি পুরস্কৃত ও প্রশংসিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখাতে সক্ষম হয়েছি।

চলচ্চিত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য দরকার চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রপত্রিকার। শুধু ছবি দেখাই নয় ছবিকে কিভাবে নানান দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় তার চর্চাও দরকার। আর সেই কারণেই বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও আমরা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রকাশনার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলাম। ২৪ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় চর্চা কেন্দ্রের মুখপত্র 'ছায়াচিত্র'-র বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। চলচ্চিত্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়াও উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলির সংক্ষিপ্তসার এতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ভালো ছবি দেখার চাহিদাকে উৎসাহিত করা ও ভালো ছবির সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টা করা থেকেই রুচিবান দর্শক তৈরি হয়। আর সেই কারণেই দরকার আলোচনা সভার। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'শিল্পের দায় বনাম সামাজিক দায়'– সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র বিষয়ক এক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক অনন্য ভট্টাচার্য্য।

নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র ৩০ তম বর্ষে পদার্পন করলো। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আজ নানাবিধ কারণে তার শক্তি হারাচ্ছে। ছবি দেখার সহজলভ্যতা, সিনেমা হল বিমুখতার দ্বারা চলচ্চিত্র চর্চা আজ আক্রান্ত। তার উপর করোনা মহামারী কফিনের উপর শেষ পেরেক পোঁতার কাজটা করেছে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের যেটুকু প্রাণ ছিল সেটুকুও কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছে এই মহামারী। তার মধ্যেই কোনক্রমে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস আমরা করছি।

বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীগুলি করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমতাবস্থায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সারা বছরব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা কঠিন হয়ে আসছে। এ কারণে বিগত বছরে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী আমরা সংস্কৃতি লোকমঞ্চের বাইরে টাউন হল ও রবীন্দ্রভবনে করতে বাধ্য হয়েছি। আগামী দিনেও সংস্কৃতি ছাড়া অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার।

আগামী বছর আমাদের প্রিয় সংগঠনের ৩০ বছর। ১৯৯৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বর্ধমানের মত এক মফস্বল শহরে ৩০ বছরে পা দেওয়া যে কোন ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। ৩০ বছর উদযাপন আমরা করতে চাই সারা বছরব্যাপী নানান ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া আগামী বছর বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫ বছর। এই চলচ্চিত্র উৎসবটিকেও আমরা ভালোভাবে করতে চাই।

বছরভর আমাদের কর্মসূচি রূপায়নের জন্য বর্ধমান জেলা পরিষদ, বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও বর্ধমান পৌরসভার সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তার জন্য জানাই সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাই ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়াকে (পূর্বাঞ্চল)। বছরভর নানা ধরণের ছবি পাওয়াকে সুগম করে দেওয়ার জন্য।

ভালো চলচ্চিত্র মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ক্রোধ-প্রতিবাদ, আত্মবিশ্লেষণ- আত্মদর্পনের এক হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার-এর খবর চলচ্চিত্র প্রেমী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ। অতিমারির ধাক্কায় একটা সময় মনে হয়েছিল OTT মাধ্যমই বোধহয় ছবি দেখার একমাত্র উপায় দাঁড়াবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ভঙ্গুর, শতধা বিভক্ত সমাজে ন্যুব্জ মানুষও জেগে ওঠে, উঠবেও, পথ চলবে সুস্থ সংস্কৃতির পানে তার অফুরান প্রাণশক্তিকে পাথেয় করেই। তার ইঙ্গিতও বিগত সময়ে আমরা পেয়েছি। বেশ কিছুদিন ধরেই ভালো ছবি দেখতে যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক ভীড় জমাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহগুলিতে। আমরাও স্বপ্ন দেখি আগামী দিনে অন্য ধারার ভালো চলচ্চিত্র দেখার জন্য রুচিসম্পন্ন দর্শককুল আবার নাম লেখাবে ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে।

25th
Bardhaman
International
Flim
Festival

উদ্বোধনী ছবি

০৪.০১.২০২৪

চালচিত্র এখন

পরিচালক- অঞ্জন দত্ত,

৮৯ মিনিট, ভারত (অসম), ২০২৩

মৃণাল সেন সাতের দশকে যেমন ‘কলকাতা ট্রিলজি’ নিয়ে তিনটি ছবি বানিয়েছেন, তেমন আশির দশকের শুরুতেই বানিয়েছেন মধ্যবিত্ত ট্রিলজি ‘একদিন প্রতিদিন’, ‘চালচিত্র’ ও ‘খারিজ’। অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত ছবি ১৯৮৪তে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘চালচিত্র’। এই ছবির বানানো নিয়েই অঞ্জন দত্তের ছবি ‘চালচিত্র এখন’। কেমনভাবে নবাগত অঞ্জন দত্তকে খুঁজে বের করে চলচ্চিত্রে আনেন মৃণাল সেন, সেই গুরু শিষ্যের বোঝাপড়ার গল্পই বোনা হয়েছে এই ছবিতে। ২৬ বছরের রঞ্জন দত্তকে নির্বাচিত করেন ৫৭ বছরের পরিচালক কুণাল সেন (মৃণাল সেন)। সংলাপের পরতে পরতে আছে কমেডি, যা তাঁদের বন্ধুত্বকে নিবিড় করেছে। রঞ্জন দত্ত কিভাবে শহর কলকাতাকে চিনতে পারল নানা মজার ও আবেগপূর্ণ মুহূর্ত দিয়ে তারই চিত্রায়ণ। একজন চিত্র পরিচালক কিভাবে এক অভিনেতার জীবনবোধ পাল্টে দিতে পারেন, দেখার চোখ পাল্টে দিতে পারেন, সে সবের দৃশ্যায়ন হয়েছে এখানে। অঞ্জন সরাসরি মৃণাল সেনের চালচিত্রের দৃশ্য না দেখিয়ে, ক্যামেরার উল্টো দিকে কি কি হয়েছিল, তা বলে দর্শকের কৌতূহল মিটিয়েছেন। এ ছবি তাই নিছক স্মৃতিকথা নয়, শ্রদ্ধার্ঘ্য।

০৬.০১.২০২৪

নৈ

পরিচালক- রিমা বোড়া

৯১ মিনিট, অসম, ভারত ২০২১

এক বয়স্ক জেলে বিষ্ণু প্রবল বিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে সারা জীবন ধরে যেখানে সে বাস করেছে সেটাকে যেমন সে ভেবেছিলো আদৌ তেমন না। সে দেখল তার যারা সহ নাগরিক তাদের জীবনও ভয়, দারিদ্র, বেরোজগারী ও মৃত্যুর মধ্যে থেকে খুব অনিশ্চিত।

সিনেমা শুরু হচ্ছে বিষ্ণুর তার গ্রামে মাছ ধরা নিয়ে। সে কোনো দিন গ্রামের বাইরে পা দেয় নি। কিন্তু একদিন মাছ ধরতে গিয়ে জালের মধ্যে আটকে সে একটা মৃত মানুষকে পেল। কে সেই মৃত মানুষটি, তার পরিচয় জানার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। গ্রামের কেউ কিছু বলতে পারল না। বিষ্ণু তখন বাইরে বেরিয়ে পড়ল সেই মৃত মানুষটির পরিচয় জানার জন্য। সঙ্গে নিল ছোট একটা ব্যাগ। যখন সে বেরোচ্ছে তখন আর এক বয়স্ক মানুষ বিষ্ণুকে অনুরোধ করলো তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খবর আনতে। বিষ্ণু যেন সেই মেয়েকে অনুরোধ করে বাবার কাছে ফিরে যেতে কারণ তার বাবা এখন খুব নিঃসঙ্গ।

বিষ্ণু এমন কিছু সূত্র পেল না যাতে ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়। এমন লোকও পেল না যে ওই মৃত ব্যক্তির আইডেন্টিটি কার্ড থেকে কিছু বলতে পারে। সেই কার্ড থেকে মৃত ব্যক্তির জন্মস্থান জানলেও সেই নামে একাধিক গ্রাম থাকায় একটুও লাভ হলো না। বিষ্ণু মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে দেখল কারণ যাই থাক, সব গ্রামে বেশ কিছু মানুষ হারিয়ে যায়। সেই জেলের চোখ দিয়ে আসামের গ্রামগুলির অবস্থা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটি মানুষের গল্প সমান বেদনায় অনুরণিত হয়েছে।

০৫.০১.২০২৪

Cream of the Crop

পরিচালক- দিনা সালাম

১০০ মিনিট, মিশর, ২০২২

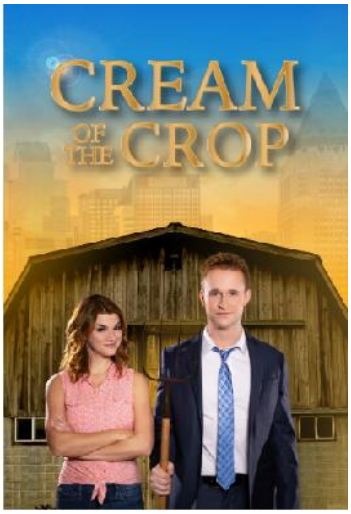

আলেকজেন্দ্রিয়ার একটা জ্যাম-জেলি তৈরীর কারখানার কর্মচারীরা প্রবল আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। সেই কর্মচারীরা সবাই চেষ্টা করে কিভাবে এই আর্থিক সমস্যা থেকে বের হওয়া যায়। সে সময় তারা সবাই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়ে। হাস্যরসের আড়ালে ছবির ঘটনাবলী আস্তে আস্তে উন্মোচিত হয়েছে।

০৬.০১.২০২৪

বিউটি সার্কাস

পরিচালক- মাহমুদ দিদার

১২০ মিনিট, বাংলাদেশ, ২০২২

বিউটি সার্কাসের মালিক বিউটি। বহু গ্রামবাসী তার এই জনপ্রিয় সার্কাস দেখে। বিউটি নিজে খেলা দেখায়। তার প্রেমে পাগল স্থানীয় রাজনীতিবিদ থেকে সমাজ বিরোধী। সবাই চায় তাকে। বিউটির এ দিকে মন নেই। তার মনকে কুরে কুরে খায় অন্য কিছু। মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিউটি যখন ছোট, তার বাবা সার্কাসের মালিক। রাজাকারদের কাছে মাথা নোয়াবে না বলে তাকে ছোট্ট বিউটির সামনে বাবাকে কোতল করা হয়। বিউটির মনে এ ঘটনা গভীর ছাপ ফেলে। বিউটি সার্কাসের সফল মালিক হলে তার সামনে আসে ধর্মীয় মৌলবাদ। তারা বলে, সার্কাসের নামে চলছে নষ্টামি, তাই সার্কাস বন্ধ করতে হবে। সার্কাসের তাঁবু পুড়িয়ে ফেলা হয়। এক জোকারকে মেরে ফেলা হয়। একজন শহিদের মেয়ে বিউটি কি এ সব মেনে নেবে? এর সঙ্গে জুড়ে আছে তার বাবার হত্যার স্মৃতি।

০৬.০১.২০২৪

Commitment Phobia

পরিচালক- Helena Huefnagel

৮৪ মিনিট, জার্মানি, ২০২১

তার প্রজন্মের অনেক একা থাকা মানুষের মত টিমের একটা 'সমস্যা' ছিল। সে আপাতভাবে কারো সাথে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করতে পারত না। বরং সে কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে ঘৃণা করত। যখন কোন মানুষ তার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করত সে প্রাণপণে তাকে দূরে ঠেলে দিত। কিন্তু একদিন যখন টিম তার মহিলা কাউন্টারপার্ট Ghost -এর সঙ্গে প্রেমে পড়ল, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করল ভালবাসার ওপর প্রান্তে। অত্যন্ত চালাক টিম যখন মনে করছে, সে এই খেলায় জিতে যাবে, তখন সে অভাবিতভাবে Ghost -এর দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। যখন সত্যিকারের ভালোবাসা টিমকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তখন Ghost রইল উদাসীন। এই রোমান্টিক কমেডির মাধ্যমে পরিচালক যেন বর্তমানকালের সম্পর্কগুলোকে একবার বিচার করে নিতে চেয়েছেন।

০৭.০১.২০২৪

পায়ের ছাপ

পরিচালক- সফিকুল ইসলাম মান্নু

১২০ মিনিট, বাংলাদেশ, ২০২২

গ্রাম থেকে শহরে এলে অনেকে ভয় পায়। পায়ের ছাপ সিনেমায় এই ভয়কে জয় করার গল্প দেখানো হয়েছে, যা আমাদের সমাজের সবার জন্য বিশেষ করে নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। এক নারীর শিকল ভাঙ্গা সংগ্রাম ও সফলতার গল্পে নির্মিত 'পায়ের ছাপ'। সাধারণ ঘরোয়া একজন নারী স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। সেই ভয়কে দূর করে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা এবং পুরুষ শাসিত সমাজে টক্কর দিয়ে চমৎকার একটা জার্ণির গল্প উঠে এসেছে এই সিনেমায়। সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হলে নারীর যে অসামান্য ভূমিকা থাকে সেই গল্প তুলে ধরা হয়েছে। নারীর শূন্য থেকে শিখরে যাওয়াই উঠে আসবে 'পায়ের ছাপ' এ । এ ছবি নারীর ক্ষমতায়নের ও নারী স্বাধীনতায় অনুপ্রেরণা দেবে।

০৭.০১.২০২৪

লক্ষ্মীর পা

পরিচালক- অভীক দাস

৭৫ মিনিট, ভারত, ২০২২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর পা' গল্প অবলম্বনে তৈরী এই ছবির পটভূমিকা ১৯৭১-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। কয়লা খনির এক শ্রমিক নতুন বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরছে। তারা বাস ধরতে পারে নি এবং ঠিক করে পায়ে হেঁটেই বাড়ি যাবে। তাদের চলার পথে পরস্পরের কথোপকথন থেকে গল্পের আকর্ষণ বাড়ে। তারা একে অপরকে আরো ভালো করে জানতে পারে। তাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয় এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আরো গভীর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পরিচালক সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকটকে দেখেছেন। ১৯৭১-এ বাংলায় খাদ্য সংকট হয়। চাষীরা ফসলের অধিকার পান না, একজন চাষী বাধ্য হয় কৃষিকাজ ছেড়ে কয়লা খনির শ্রমিক হতে। সিনেমার চরিত্রগুলির নিজস্ব আলাপচারিতার মধ্যে সেই সময়ের সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে।

মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষে
বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের শ্রদ্ধার্ঘ্য
টাউন হল, ১৪.০৫.২৩ সন্ধ্যা ৬টা